# জন্ম ও মৃত্যু

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নূতন সংস্করণ
২৮শে ভাদ্র, ১৩৬২

তিন টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০, কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

# যদু হাজরা ও শিখিধ্বজ

আপনারা একালে যদু হাজরার নাম বোধ হয় অনেকেই শোনেন নি।

আমাদের বাল্যকালে কিন্তু যদু হাজরাকে কে না জানত? চব্বিশ-পরগণা থেকে মুরশিদাবাদ এবং ওদিকে বর্ধমান থেকে খুলনার মধ্যে যেখানেই বাজারে বা গঞ্জে বড় বারোয়ারীর আসরে যাত্রা হ'ত সে সব স্থানে দশ বার ক্রোশ পর্যন্ত যদু হাজরার নাম লোকের মুখে মুখে বেড়াত। কাঠের পুতুল চোখ মেলে চাইত—যদু হাজরার নাম শুনলে। আপনারা কেউ কি যদু হাজরাকে 'নল দময়ন্তী' পালাতে নলে-র পার্ট করতে দেখেন নি? তা হলে জীবনের বহু ভালো জিনিসের মধ্যে একটা সেরা ভালো জিনিস হারিয়েছেন।

আমি দেখেছি।

সে একটা অদ্ভুত দিন আমার বাল্য জীবনে। তখন আমার বয়স হবে বার কি তের। আমাদের গ্রামের একটি নববিবাহিতা বধূর বাপের বাড়িতে কি একটা কাজ উপলক্ষে, নব বধূটিকে নৌকা করে তার বাড়িতে আমাকেই রেখে আসতে হবে ঠিক হ'ল।

পৌষ মাস। খুব শীত পড়েছে। বধূটি গ্রাম সম্পর্কে আমার গুরুজন, আমার চেয়ে তিন চার বছরের বড়ও বটে। দুজনে গল্পগুজবে সারাপথ কাটালুম। তাঁর বাপের বাড়ি পৌঁছে আমি কিন্তু পড়লুম একটু মুস্কিলে। মস্ত বড় বাড়ি; উৎসব

উপলক্ষে অনেক জায়গা থেকে আত্মীয়-কুটুম্বের দল এসেছে, তার মধ্যে দুটি শহর অঞ্চলের চালাক চতুর জ্যাঠা ছেলে আমার বড় অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠল। আরও এত ছেলে থাকতে তারা আমাকেই অপ্রতিভ কোরে কেন যে এত আমোদ পেতে লাগল, তা আমি আজও ঠিক বুঝতে পারি না।

একটি ছেলের বয়স বছর পনের হবে। রং ফর্সা, ছিপ্ ছিপে, সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে—নাম ছিল যতীন, নামটা এখনও মনে আছে। সে আমাকে বললে—কি পড় ?

আমি বললাম—মাইনর সেকেণ্ড ক্লাসে পড়ি।

সে বললে—বলত হাঁচি মাইনাস কাসি কত ?

প্রশ্ন শুনে আমি অবাক্।

বাঙ্গালা স্কুলে পড়ি, "মাইনাস্" কথার মানে তখন জানিনে। তা ছাড়া একি অদ্ভুত প্রশ্ন! আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে অমনি আবার জিজ্ঞাসা করলে—"হবগবলিন" মানে কি ?

আমি ইংরাজী পড়ি বটে কিন্তু সে সুশীল ও সুবোধ আবদুলের গল্প, দারোয়ান ও জেলের গল্প, বড় জোর গুটীপোকা ও রেশমের কথা। সে সবের মধ্যে ঐ অদ্ভুত কথাটা নেই। লজ্জায় লাল হয়ে বললুম—পারবনা।

কিন্তু তাতেও আমার রেহাই নেই। ভগবান সেদিন লোক সমাজে আমাকে নিতান্ত হেয় প্রমাণিত করতেই বোধ হয় যতীনকে ওদের বাড়িতে হাজির করেছিলেন। সে দু' হাতের আঙ্গুলগুলো প্রসারিত ক'রে আমার সামনে দেখিয়ে বললে—এতগুলো কলা যদি এক পয়সা হয় তবে পাঁচটা কলার দাম কত ?

আমি বিষণ্ণ মুখে ভাবছি, ওর দু' হাতের মধ্যে কতগুলো কলা ধরতে পারে—সে খিলখিল করে হেসে উঠে বিজ্ঞের ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে আমার মাইনর স্কুলে সেকেণ্ড ক্লাসে অর্জিত বিদ্যার অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রতিপন্ন করলে।

তারপর থেকে আমি তাকে ভয়ে-ভয়ে এড়িয়ে চলতে লাগলুম। বয়স তার আমার চেয়ে বেশিও বটে, শহর অঞ্চলে ইংরাজী স্কুলে পড়েও বটে, দরকার কি ওর সঙ্গে মিশে? তা ছাড়া চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমি আর কত অপমানই বা সহ্য করি!

কিন্তু সে আমায় যতই জ্বালাতন করুক, জীবনে সে আমার একটা বড় উপকার করেছিল—সে জন্যে আমি তার কাছে চির-কাল কৃতজ্ঞ। সে যদু হাজরার অভিনয় আমাকে দেখিয়েছিল।

সন্ধ্যার কিছু আগে সে আমায় বললে—এই, কি তোমার নাম, রাজগঞ্জের বাজারে বারোয়ারী হবে, শুনতে যাবে?

রাজগঞ্জ ওখান থেকে প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ। হেঁটেই যেতে হবে, কিন্তু যাত্রা শুনবার নামে আমি এত উত্তেজিত হ'য়ে উঠলাম যে, এই দীর্ঘ পথ-এর সাহচর্যে অতিক্রম করবার যন্ত্রণার দিকটা একেবারেই মনে পড়ল না।

তথাপি সারা পথ যতীন ও তার দলের তারই বয়সী জন কয়েক ছোকরা অশ্লীল কথাবার্তা ও গানে আমাকে নিতান্ত উত্যক্ত করে তুললে। আমি যে বাড়ির আবহাওয়ায় মানুষ,—আমার বাবা, মা, জ্যাঠামশায় সকলেই নিতান্ত বৈষ্ণব প্রকৃতির। প্রায় আমারই বয়সী ছেলের মুখে ওরকম টপ্পা ও খেউড় শুনে আমার অনভিজ্ঞ বালক-মনের নীতিবোধ ক্রমাগত ব্যথা পেতে লাগল।

ওরা কিন্তু আমায় রাজগঞ্জের বাজারে পৌঁছে একেবারে রেহাই দিলে। সেই অপরিচিত জন-সমুদ্রে আমায় একা ফেলে ওরা যে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল—আমি কোন সন্ধানই করতে পারলুম না।

যাত্রা বোধ হয় রাত্রে, তখন সবে সন্ধ্যা হয়েছে, বারোয়ারীর খুব বড় আসর, অনেক ঝাড়-লণ্ঠন টাঙিয়েছে—বাঁশের জাফরীর গায়ে লাল-নীল কাগজের মালা ও ফুল, আসরের চারিধারে রেলিং দিয়ে ঘেরা, রেলিং-এর মধ্যে বোধ হয় ভদ্রলোকদের বসবার জায়গা—বাইরে বাজে লোকদের।

রাজগঞ্জের বাজারে আমি জীবনে আরও দু'একবার বাবার সঙ্গে এর আগে না যে এসেছি এমন নয়, কিন্তু এখানে না আমি কাউকে চিনি, না আমাকে কেউ চেনে। রেলিং-এর ভিতরে জায়গা আমার মত ছোট ছেলেকে কেউ দিলে না—আমিও সাহস করে তার মধ্যে ঢুকতে পারলুম না, বাইরে বাজে লোকদের ভিতরের মধ্যে ঠেসাঠেসি করে ইট পেতে বসতে গেলুম—তাতেও নিস্তার নেই—বারোয়ারীর মুরুব্বি পক্ষের লোকেরা এসে আমাদের সে জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বিশিষ্ট লোকদের জন্য বেঞ্চি আনিয়ে পাতিয়ে দেয়,—আবার যেখানে গিয়ে বসি, সেখানেও কিছুক্ষণ পরে সেই অবস্থা। অতি কষ্টে আসরের কোণের দিকে দাঁড়াবার জায়গা কোন মতে খুঁজে নিলুম। অন্যান্য বাজে লোকদের কি কষ্ট! তারা প্রায়ই চাষাভূষো লোক, পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে থেকে পর্যন্ত অনেকে মহা আগ্রহে যাত্রা শুনতে এসেছে—এই শীতে তারা কোথায়ও বসবার জায়গা পায় না, কেউ তাদের বসবার বন্দোবস্ত করেনা—স্টেশন মাস্টারবাবু, মালবাবু,

কেরানীবাবু ও পোস্ট মাস্টারবাবুদের যত্ন করে বসাতে সবাই মহা ব্যস্ত।

যাত্রা আরম্ভ হ'ল। নল-দময়ন্তীর পালা। একটু পরেই যদু হাজরা "নল" সেজে আসরে ঢুকতেই—তখন হাততালির রেওয়াজ ছিল না—চারিদিকে হরিধ্বনি উঠল। অত বড় আসর মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির ও নীরব হ'য়ে গেল।

আমি যদু হাজরার নাম কখনো এর আগে শুনিনি, এই প্রথম শুনলুম। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম, শ্যামবর্ণ, সুপুরুষ—বয়স তখন বুঝবার ক্ষমতা হয়নি, ত্রিশও হ'তে পারে, পঞ্চাশও হ'তে পারে। কিন্তু কি কথা বলবার ভঙ্গি, কি চোখ মুখের ভাব, কি হাত পা নাড়ার ঢং। আমার এগারো বৎসরের জীবনে আর কখনো অমনটি দেখিনি। ভিড়ের কষ্ট ভুলে গেলুম, কিছু খেয়ে বেরুই নি, খিদেতে পেটের মধ্যে যেন বোল্‌তায় হুল ফোটাচ্ছে—সে কথা ভুললুম—যাত্রা থেমে গেলে এত রাত্রে একা অজানা স্থানে শীতে কোথায় যাব—সে সব কথাও ভুলে গেলুম—পঞ্চ দেবতা পঞ্চ নলরূপে দময়ন্তীর স্বয়ম্বর সভায় এসে বসেছেন, আসল "নল"-রূপী যদু হাজরা বিস্ময়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারদিক চেয়ে বলছেন—

এ কি হেরি চৌদিকে আমার—
মম সম রূপ নল চতুষ্টয়
মম সম সাজে সাজি বসিয়াছে
সভা মাঝে।
বুঝিতে না পারি কিবা মায়াজাল
ইষ্টদেব,
পুরাও বাসনা মোর, মায়া জাল ফেল ছিন্ন করি।

এমন সময়ে বরমালা হস্তে দময়ন্তী সভায় প্রবেশ করতেই নল বলে উঠলেন—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে
আনন্দ-বারতা ? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভ পাশে।—

অপর চার জনও সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে বলে উঠল—

দময়ন্তী, দময়ন্তী, মনে পড়ে হংসী মুখে
আনন্দ-বারতা ? এই আমি নল-রাজ
বসি স্তম্ভ পাশে।—

প্রকৃত নলের তখন কি বিমূঢ় দৃষ্টি !

তারপরে বনে-বনে ভ্রাম্যমাণ রাজ্যহীন সহায়-সম্পদহীন উন্মত্ত নলের সে কি করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী চিত্র ! কতকাল তো হয়ে গেল, যদু হাজরার সে অপূর্ব অভিনয় আজও ভুলিনি। চোখের জল কতবার গোপনে মুছলুম সারারাত্রির মধ্যে, পাছে আশপাশের লোক কান্না দেখ্‌তে পায়, কতবার হাঁচি আনবার ভঙ্গীতে কাপড় দিয়ে মুখ চেপে রাখলুম। যাত্রা শেষরাত্রে ভাঙ্‌ল। কিন্তু পরদিনও আবার যাত্রা হবে শুনে আমি বাড়ি গেলুম না। একটা খাবারের দোকানে কিছু খেয়ে সারাদিন কাটিয়ে দিলাম। রাত্রে আবার যাত্রা হ'লো—শিখিধ্বজের পালা। যদু হাজরা সাজলে শিখিধ্বজ। এটা নাকি তার বিখ্যাত ভূমিকা, শিখিধ্বজের ভূমিকায় যদু হাজরা আসর মাতিয়ে পাগল করে দিলে। সেই একরাত্রের অভিনয়ের জন্যে চার পাঁচখানা সোনা ও রূপোর মেডেল পেলে যদু হাজরা। যাত্রা ভাঙ্‌ল যখন তখন রাত বেশি নেই। আসরে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে রাত কাটিয়ে সকালে একা নিজের গ্রামে ফিরে এলুম।

তারপর কয়েক বছর কেটেছে। তখন আমি আরও একটু বড় হয়েছি—স্কুলে ভর্তি হয়েছি। যদু হাজরার কথা প্রায় এর ওর মুখে শুনি। যেখানেই যাত্রা দলের কথা ওঠে, সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করে যাত্রা দলের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা যদু হাজরা।

আমি কিন্তু বহুদিন যদু হাজরাকে আর দেখলুম না।

এর অনেক কারণ ছিল।

আমি দূরের শহরের স্কুল-বোর্ডিং-এ গেলুম।

মন গেল লেখাপড়ার দিকে, ধরাবাঁধা রুটীনের মধ্যে জীবনের মুক্ত গতি বন্ধ হ'য়ে পড়ল। এ্যালজেব্রার আঁক, জ্যামিতির এক্স্ট্রা, ইংরাজী ভাষার নেশা, ফুটবল, ডিবেটিং ক্লাব, খবরের কাগজ—জীবনের মধ্যে নানা পরিবর্তন এনে দিলে। ছেলেবেলার মতো যে যেখানে যাত্রার নাম শুনব সেখানেই দৌড়ে যাব—তা কে জানে চার ক্রোশ, কে জানে ছ' ক্রোশ—এমন মন ক্রমে ধীরে ধীরে বদলে যেতে লাগল। ইচ্ছে হ'লেও হয়তো স্কুলের ছুটি থাকে না, স্কুলের ছুটি থাকলেও বোর্ডিং-এর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছাড়তে চান না—নানা উৎপাত।

পাড়াগাঁয়ের ছেলে ছিলুম, থিয়েটার কাকে বলে জানতুম না। যে শহরে পড়তুম, সেখানে উকিল-মোক্তারদের একটা থিয়েটার ক্লাব ছিল, তারা একবার থিয়েটার করলেন, পালাটা ঠিক মনে নেই—বোধ হয় "প্রতাপাদিত্য"। ভাষা ও ঘটনার বিন্যাসে থিয়েটারের পালা আমাকে মুগ্ধ করল—ভাবলুম যাত্রা এর চেয়ে ঢের খারাপ জিনিস। প্লটের এমন বাঁধুনী তো যাত্রার পালাতে নেই? তারপর অনেকবার উকিলদের ক্লাবে থিয়েটার দেখলুম—ছেলেবেলার মন ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে,

বাজারে যাত্রা হ'ল বারোয়ারীর সময়ে, কলকাতার দল, কিন্তু তাতে আগেকার মতো আনন্দ পেলুম না।

তারপর কলকাতায় এলুম। তখন নতুন মতের অভিনয় সবে কলকাতায় শুরু হ'য়েছে। বড় বড় বহু বিখ্যাত নটদের অভিনয় দেখবার সুযোগ জীবনে এই প্রথম ঘটল, তাদের নানা পালাতে নানা অভিনয় দেখলুম,—বিলিতী ফিল্‌মে বিশ্ব-বিখ্যাত নটদের অভিনয় অনেকদিন ধরে দেখলুম—মানুষ ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়, উকিল-মোক্তারদের প্রধান অভিনেতা গুরুদাস ঘোষ—যাকে এতকাল মনে মনে কত বড় বলে ভেবে এসেছি—এখন তার কথা ভাবলে আমার হাসি পায়।

আরও কয়েক বছর কেটে গেল। কলেজ থেকে বেরিয়ে চাকুরি করি। কলকাতার থিয়েটারের অভিনেতারাও তখন আমার কাছে পুরোনো ও একঘেয়ে হয়ে গিয়েছে,—থিয়েটার দেখাই দিয়েছি ছেড়ে। ফিল্‌ম্ সম্বন্ধেও তাই। খুব নামজাদা অভিনেতা না থাকলে সে ছবি দেখতে যাইনে—যাঁদের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি একদিন—এখন তাদের অনেকের সম্বন্ধেই মত বদলেছি।

এই যখন অবস্থা, তখন কি একটা ছুটিতে বাড়ি গিয়ে শুনি দেশে বারোয়ারী। শুনলুম, ক'লকাতা থেকে বড় যাত্রার দল আসছে—দেড়শো টাকা এক রাত্রির জন্যে নিয়েছে, এমন দল নাকি এদেশে আর কখনও আসে নি। ভালো বিলিতী ফিল্‌ম্‌ই দেখিনে, থিয়েটার দেখাই ছেড়ে দিয়েছি ভালো লাগে না ব'লে —এ অবস্থায় রাত জেগে যাত্রা দেখবার যে বিন্দুমাত্র ইচ্ছাও মনে জাগবে না—একথা বলাই বাহুল্য। যাত্রা আবার কি দেখব! নিতান্ত বাজে জিনিস—কে কষ্ট করে এই গরমের মধ্যে লোকের ভিড়ে বসে যাত্রা দেখ্‌তে যাবে?

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা ছাড়লেন না। বারোয়ারীর কর্তৃপক্ষেরা বিশেষ বিশেষ অনুরোধ করে গেলেন—আমার যাওয়া চাই-ই। কি করি, ভদ্রতা বলেও তো একটা ব্যাপার আছে। খানিকটা দেখে না হয় উঠে এলেই হবে। নিতান্ত না যাওয়াটা ভালো দেখাবে না হয় তো—বিশেষ দেশে যখন তত বেশি যাতায়াত নেই।

সন্ধ্যার সময় যাত্রা বসল। যাত্রা জিনিসটা দেখিনি অনেককাল—দেখে বুঝলুম সেকালের যাত্রা আর নেই। জুড়ীর গান, মেডেলধারী বেহালাদারদের দীর্ঘ কসরৎ—এ সব অতীত ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সলমা-চুমকীর কাজ করা সাজ পোশাকও আর নেই—ক'লকাতার থিয়েটারের হুবহু অনুকরণ যেমন সাজ-পোশাকে, তেমনি তরুণ অভিনেতাদের অভিনয়ের ঢঙ্গে। এমন কি কয়েকজন অভিনেতার ব'লবার ধরন, মুখভঙ্গি ও হাত-পা নাড়ার কায়দা, ক'লকাতার ষ্টেজের কোন কোন নামজাদা বিশিষ্ট অভিনেতার মতো। দেখলুম, আসরের শ্রোতার দলের মধ্যে যারা তরুণ বয়স্ক তাদের কাছে এরা পেলে ঘন ঘন হাততালি। কেউ কেউ বললে—ওঃ, কি চমৎকার নকলই করেছে ক'লকাতার ষ্টেজের অমুককে—বাস্তবিক দেখবার জিনিস বটে!

এমন সময় আসরে ঢুকলো একজন মোটা কালো ও বেঁটে লোক। কিসের পার্টে তা আমার মনে নেই। লোকটির বয়স ষাটের উপর হবে, তবে স্বাস্থ্যটা ভালো। কেউ তার বেলা একটা হাততালিও দিলে না, যদিও সে দর্শকদের খুশি করবার জন্যে অনেক রকম মুখভঙ্গি করলে, অনেক হাত-পা নাড়লে। আমার সঙ্গে একদল স্কুলের ছেলে বসেছিল, তাদের মধ্যে একজন

ব'লে উঠল—এ বুড়োটাকে আবার কোথা থেকে জুটিয়েছে? দেখতে যেন একটা পিপে। এ্যাক্‌টিং করছে দেখ্‌না ঠিক যেন সঙ!

পাশের আর একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—ও এককালে খুব নামজাদা এ্যাক্টার ছিল হে, তখন তোমরা জন্মাও নি। ওর নাম যদু হাজরা।

আমি হঠাৎ ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাইলুম, তারপর একবার বৃদ্ধ অভিনেতাটির দিকে চাইলুম। বাল্য দিনের একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। সেই কনকনে শীতের রাত্রি, সেই শহুরে ডেঁপো-ছেলেদের সঙ্গ, সেই তারা আমাকে ফেলে কোথায় পালাল—তারপর বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক অপরিচিত গঞ্জের বারোয়ারী আসরে ময়রার দোকানে খাবার খেয়ে আমার সেই একা বিদেশে দু'দিন কাটানো। সে রাত্রে যার অভিনয় দেখে আমার বালক মন মুগ্ধ বিস্মিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল—সেই যদু হাজরা এই?

এক সময়ে তার যে ধরনের মুখভঙ্গি দেখে ও কথাবার্তার উচ্চারণ শুনে দর্শকেরা আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে উঠত, আজও যদু হাজরা সেই সব হুবহু করে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে—অথচ দর্শকেরা খুশি নয় কেন? খুশি তো দূরের কথা, তাদের মধ্যে অনেকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করছে কেন, ব'সে ব'সে এই কথাটাই ভাবলুম।

মন যেন কেমন বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। অপর লোকের কথা কি, আমারই তো যদু হাজরার হাব-ভাব হাস্যকর ঠেকছে! কেন এমন হয়?

বাল্য দিনের সেই যাত্রার আসরে এঁকে আমি দেখেছিলুম,

এঁর সেই অভিনয় এখনও স্পষ্ট মনে আছে। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতির সঙ্গে রাজার কনিষ্ঠা পত্নী ভ্রষ্টা, রাজা একদিন দুজনকে নির্জনে প্রেমালাপে নিমগ্ন দেখতে পেয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন। কি ভেবে বললেন—'মধুচ্ছন্দা, আমি প্রৌঢ়, তুমি তরুণী, এই বয়সে তোমায় বিবাহ করে ভুল করেছি। তোমায় আমি এখনও ভালোবাসি, প্রাণে মারবো না—তোমরা দুজনে আমার চোখের সামনে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো হাত ধরাধরি করে চলে যাও। কিন্তু আমার রাজ্যের বাইরে। আর কখনও তোমাদের মুখ না দেখি।' ওরা ধরা পড়ে দুজনে ভয়ে ও লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছে। রাজার সামনে একাজ কেমন করে করবে? হাত ধরাধরি করে কেমন করে যাবে? রাজা তলোয়ার খুলে বললেন—'যাও, নইলে দুজনকেই কেটে ফেলব—ঠিক ওই ভাবেই যাও।'

শেষে তারা তাই করতে বাধ্য হ'ল। রাজা স্থির দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে ছিলেন—তারা যখন কিছুদূর চ'লে গিয়েছে, তখন তিনি হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মতো মুক্ত তলোয়ার হাতে 'হা—হা—হা' রবে একটা চিৎকার করে তাদের দিকে ছুটে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে তারাও আসরের বাইরে চলে গেল। মনে আছে রাজার সেই চমৎকার ভঙ্গিতে, তার হতাশ 'হা—হা'—রবের মধ্যে এমন একটা ট্র্যাজিক সুর ছিল, আসরসুদ্ধ দর্শককে তা বিচলিত করেছিল। আমি তখন যদিও নিতান্ত বালক, কিন্তু আমার মনে সেই দৃশ্যটি এমন গভীর দাগ দিয়েছিল যে, এই এত বয়সেও তা ভুলিনি।

পরের দিন যদু হাজরার সঙ্গে দেখা হ'ল। ওদের যেখানে বাসা দিয়েছে, তার সামনে একটা টুলের উপর বসে সে তামাক

টানছে। আমি বললুম—কাল আপনার পার্ট বড় চমৎকার হ'য়েছে। বৃদ্ধ আগ্রহের সুরে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনার ভালো লেগেছে? বললুম—চমৎকার! এমন অনেক দিন দেখিনি!

কথাটার মধ্যে সত্যের অপলাপ ছিল। বৃদ্ধ খুব খুশি হ'ল, মনে হ'ল প্রশংসা জিনিসটা বেচারীর ভাগ্যে অনেক দিন জোটেনি। আসরে কাল যখন তরুণ অভিনেতাদের বেলায় ঘন ঘন হাততালি পড়েছে, যদু হাজরার ভাগ্যে সে জায়গায় বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছুই জোটেনি।

বৃদ্ধ বললে—আপনি বোঝেন তাই আপনার ভালো লেগেছে। আর কি মশায় সেদিন আছে? এখানকার সব হয়েছে আর্ট—আর্ট, সে যে কি মাথামুণ্ডু তা বুঝিনে। বৌ-মাস্টারের দলে ভৃগু সরকার ছিল। রাবণের পার্টে অমন এ্যাক্টো আর কেউ কখনও করবে না। আমি সেই ভৃগু সরকারের শাগরেদ—বুঝলেন? আমায় হাতে ধরে শিখিয়েছেন তিনি। মরবার সময় আমার হাত ধ'রে ব'লে গেলেন—যদু, তোমায় যা দিয়ে গেলাম, তোমার জীবনে আর ভাবনা থাকবে না।

আমি বললুম—এ বয়সে আপনি আর চাকুরি কেন করেন?

—না ক'রে কি করি বলুন? বড় ছেলেটি উপযুক্ত হ'য়েছিল, আজ বছর দুই হ'ল কলেরা হয়ে মারা গেল। তার সংসার আমারই ওপর, নাতনীটির বিয়ে দিতে হবে আর কিছুদিন পরেই। পয়সা আগে যা রোজগার করেছি, হাতে রাখতে পারিনি। এখন আর তেমন মাইনেও পাইনে। দেড়শো টাকা পর্যন্ত মাইনে পেয়েছি এক সময়—আমার জন্য অধিকারী আলাদা দুধ বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল, যখন ভূষণ দাসের দলে থাকতাম।

এখন পাই পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। আর সতীশ ব'লে ওই-যে ছোকরা কাল রামের পার্ট করলে—সে পায় আশী টাকা। ওরা নাকি আর্ট জানে। আপনিই বলুন তো, কাল ওর পার্ট ভালো লাগল আপনার, না আমার পার্ট ভালো লাগল ? এখনকার আমলে ওদেরই খাতির বেশি অধিকারীর কাছে। আমাদের চাকরি বজায় রাখাই কঠিন হ'য়েছে।

মনে মনে ভেবে দেখলুম, যদু হাজরার এতদিন বেঁচে থাকাটাই উচিত হয়নি। চল্লিশ বছর আগে তরুণ যদু হাজরাকে বৌ-মাস্টারের দলের ভৃগু সরকার যে ভাবে হাত-পা নাড়বার ভঙ্গি ও উচ্চারণের পদ্ধতি শিখিয়েছিল, বৃদ্ধ যদু হাজরা আজও যদি তা আসরে দেখাতে যায়, তবে বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু প্রাপ্য হবে না—একথা তাকে বলি কেমন করে ? কালের পরিবর্তন তো হয়েছেই, তাছাড়া তরুণ বয়সে যা মানিয়েছে এ বয়সে তা কি আর সাজে ?

এই ঘটনার বছর পাঁচ ছয় পরে নেবুতলার গলি দিয়ে যাচ্ছি ; একটা বেনেতি মশলার দোকানে দেখি যদু হাজরা বসে আছে। দেখেই বুঝলুম দারিদ্র্যের চরম সীমায় এসে সে ঠেকেছে। পরনে অর্ধমলিন থান, পিঠের দিক্‌টা ছেঁড়া এক ময়লা জামা গায়ে। আমায় দেখে সে চিনতে পারলে না। আমি ওকে খুশি করবার জন্যে বললুম—আপনি চিনতে পারুন আর নাই পারুন, আপনাকে না চেনে কে! আগুন কি ছাই চেপে ঢেকে রাখা যায় ? তা এখন বুঝি ক'লকাতায় আছেন ?

বৃদ্ধের চোখে জল এল প্রশংসা শুনে। বললে, আর বাবু মশায়, আমাদের দিন ফুরিয়েছে। এই দেখুন, আজ তিনটি বছর চাকুরি নেই। কোন দলে নিতে চায় না। বলে, আপনার

বয়স হয়েছে হাজরা মশাই, এ বয়সে আর আপনার চাকরি করা পোষাবে না, আসল কথা আমাদের আর চায় না। ভালো জিনিসের দিন আর নেই, বাবু মশায়। এখানকার কালে সব হয়েছে মেকি। মেকির আদর এখন খাঁটি জিনিসের চেয়ে বেশি। আমার গুরু ছিলেন বৌ-মাষ্টারের দলের ভৃগু সরকার, আজকালকার কোন্ ব্যাটা অ্যাক্‌টার ভৃগু সরকারের পায়ের ধুলোর যুগ্যি আছে? 'রাই উন্মাদিনী' পালায় আয়ানঘোষের পার্টে যে একবার ভৃগু সরকারকে দেখেচে—

আরও বার কয়েক প্রশংসা ক'রে এই ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ নটকে শান্ত করলুম। জিজ্ঞাসা ক'রে ক্রমশ জানলুম এই মশলার দোকানই বৃদ্ধের বর্তমান আশ্রয় স্থল। কাছেই গলির মধ্যে কোন ঠাকুরবাড়িতে এক বেলা খেতে দেয়, রাত্রে এই দোকানটাতে শুয়ে থাকে। দোকানের মালিক বোধ হয় ওর জানাশোনা।

কার্যোপলক্ষে গলিটা দিয়ে প্রতিদিনই যাতায়াত করি, আর ফিরবার সময়ে যতু হাজরার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করি। একদিন বৃদ্ধ বললে—বাবু মশাই, একটা কথা বলব? একদিন একটু মাংস খাওয়াবেন? কতকাল খাইনি।

একটা ভালো রেস্টোরেণ্টে তাকে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালুম। ওর খাওয়ার ভঙ্গি দেখে মনে হ'ল, বৃদ্ধ কতদিন ভালো জিনিস খেতে পায়নি। তারপর দুজনে একটা পার্কে গিয়ে বসলুম। রাত তখন ন'টা বেজে গিয়েছে। শীতকাল, অনেকে পার্ক থেকে চলে গিয়েছে। একটা বেঞ্চে বসে বৃদ্ধ নিজের সম্বন্ধে কত কথাই বললে। কোন্ জমিদার কবে তাকে আদর করে ডেকে নিজের হাতে সোনার মেডেল পরিয়ে দিয়েছিলেন, তার অভিনয়

দেখে কবে কোন্ মেয়ে তার প্রেমে পড়েছিল, হাতীবাঁধার রাজা নিজের গায়ের শাল খুলে ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলেন।

বলতে বলতে মাঝে মাঝে যেন ও অন্যমনস্ক হয়ে পড়চে। পঁচিশ বৎসর আগের কোন্ তরুণী প্রেমিকার হাসিমাখা চাহনি ওর আবেশ মধুর যৌবনদিনগুলির উপর স্পর্শ রেখে গিয়েচে—কে জানে সেই সব দিন, সেই সব বিস্মৃতপ্রায় মুখ ও মনে আনবার চেষ্টা করছিল কিনা। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম—শিখিধ্বজ আর মধুচ্ছন্দার সেই অভিনয় আমার বড় ভালো লাগে, সেই যখন রাজা বললেন, 'তোমরা প্রেমিক প্রেমিকার মতো হাত-ধরাধরি করে চলে যাও'—সেই জায়গাটা এখনও ভুলিনি।

বৃদ্ধ নট সোজা হয়ে বসল। তার চোখে যৌবন-কালের সেই হারানো দীপ্তি যেন ফিরে এল। বললে—ওঃ, সে কত কালের কথা যে! ও পালা গেয়েছি প্রসন্ন নিয়োগীর দলে থাকতে। দেখবেন—করে দেখাব ?

আমি উৎসাহের সঙ্গে বললুম—মনে আছে আপনার ? দেখান না ?

ভাগ্যে পার্কে তখন বিশেষ কেউ ছিল না। বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াল—আমি হলুম মধুচ্ছন্দা। ও নিজের পার্ট ব'লে যেতে লাগল—দেখলুম কিছুই ভোলেনি। শেষে আমার দিকে ফিরে জলদ-গম্ভীর সুরে বললে—যাও মধুচ্ছন্দা, তোমরা দুজনে প্রেমিক-প্রেমিকার মতো হাত ধরাধরি করে চলে যাও। তারপর আমি কয়েক পা এগিয়ে যেতেই বৃদ্ধ তার সেই পুরানো ট্র্যাজিক সুরে 'হা-হা-হা-হা' করে আমার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে এল। সত্যই কি অপূর্ব সে সুর! কি অপূর্ব ভঙ্গি! ভগ্নহৃদয় বৃদ্ধ

নট তার জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি ওর মধ্যে ঢেলে দিলে। যেন সত্যিই ও ভগ্নহৃদয় প্রৌঢ় রাজা শিখিধ্বজ, অবিশ্বাসিনী মধুচ্ছন্দা ওকে উপেক্ষা ক'রে তার তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে হাত-ধরাধরি করে চলে গেল! অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্যে বৃদ্ধ যদু হাজরা ত্রিশ বছর আগেকার তরুণ নট যদু হাজরাকেও ছাড়িয়ে গেল।

এই যদু হাজরার শেষ অভিনয়। এর মাস খানেক পরে একদিন নেবুতলায় সেই মশলার দোকানটাতে খোঁজ করতে গিয়ে শুনলুম সে মারা গিয়েছে।

## জন্ম ও মৃত্যু

জীবনের মাঝে মাঝে বেশ চমৎকার ব্যাপার ঘটে। ভেবে দেখবার ও উপভোগ করবার জিনিস হিসেবে সেগুলোর মূল্য বড় কম নয়। সম্প্রতি আমার অভিজ্ঞতার গণ্ডীর মধ্যে এমনই একটা ঘটনা এসে পড়েছিল—ঠিক একটা ঘটনা না ব'লে বরং তাকে দুটো ঘটনার সমষ্টিই বলা যেতে পারে।

মধুপুরে একটা বাড়ি ভাড়া করবার দরকার ছিল—এক জায়গায় সন্ধান পেলাম—ভবানীপুরের এক ভদ্রলোকের বাড়ি আছে মধুপুরে এবং তিনি সেটা ভাড়া দেবেন। সকাল বেলা তাঁর ওখানে গেলাম, বেলা তখন দশটা। ভবানীপুরে ভদ্রলোক যে বাড়িতে থাকেন তা বেশ বড় বাড়ি। বাইরে সুসজ্জিত বৈঠক-খানা, কিন্তু তিনি তখন বৈঠকখানার পাশে একটা ছোট ঘরের তক্তাপোশের উপর ব'সে গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়ে তামাক খাচ্ছিলেন।

ভদ্রলোক বৃদ্ধ, বয়সে পঁয়ষট্টির কাছাকাছি মনে হ'ল। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর বয়সের সম্বন্ধে আমার মনে কোন কল্পনার স্থান রাখলেন না। বললেন—আসুন, আসুন, বড় ভালো দিনে এসেছেন। আজ আমার জন্মতিথি কি-না, তাই বাড়িতে একটু উৎসব গোছের আছে। তা বেশ, এসেছেন যখন আপনাকেও ছাড়ছিনে—ইত্যাদি।

কারুর জন্মতিথি উৎসবে যে ভাবে তাকে মিষ্ট কথা বলবার কথা আছে—ভদ্রলোককে আমি তা বললাম। কাজের কথাটা

এই উৎসবের দিনে কি ভাবে পাড়া যায়? বা কতক্ষণ ধ'রে জন্মতিথিতে মঙ্গলেচ্ছা প্রকাশ সংক্রান্ত কথাবার্তা বলবার পরই বা কাজের কথা পাড়া সুষ্ঠু হবে—কিংবা আজকার দিনে বাড়ি ভাড়ার দরদস্তুররূপ ইতরজনোচিত কথাবার্তা বলা আদৌ শোভন হবে কি-না—ইত্যাদি মনে মনে তোলা-পাড়া করছি এমন সময়ে একটি সুন্দরী তরুণী হাসি মুখে বড় একটা ফুলের তোড়া হাতে ঘরে ঢুকলেন, পেছনে একটি যুবক। গৃহকর্তা ব'লে উঠলেন—এই যে অরুণা এসেছিস্ দিদি—ওঃ, পেছনে যে নির্মলকে গাঁটছড়া বেঁধে এনে হাজির করেছিস্—ছেড়ে আসা যায় না বুঝি? বেশ বেশ, আমরা হয়ে গিয়েছি এখন বুড়োসুড়ো—"

তরুণী ফুলের তোড়াটি বৃদ্ধের হাতে দিয়ে প্রণাম ক'রে এবং হাসি মুখে বৃদ্ধের গালে ছুটি ঠোনা মেরে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল, যুবকটিও গেল পেছনে পেছনে। বৃদ্ধ বললেন—আমার নাতনী—আমার বড় ছেলের মেয়ে। আই, এ, পাস—ও বছর বিয়ে হয়েছে—স্বামী ইঞ্জিনিয়ার, বিলেত ফেরত, কর্পোরেশনে ভালো চাকরি পেয়েছে।

কথা তখনও ভালো ক'রে শেষ হয়নি, আর ছুটি তরুণী ঘরে ঢুকল—এদের ঘাড়ের উপর এলোখোপা এলিয়ে পড়েছে—পরনে জামিয়ারের মতো ছোট কল্কার কাজ করা নীল শাড়ি ও ব্লাউজ, গলায় সরু মফ্‌চেন, পায়ে সোনালী জরীর কাজ করা নাগরা। ছুইটিই অবিবাহিতা—একটি গৌরী, অপরটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা। এরাও ফুলের তোড়া দিলে—গৌরী মেয়েটি ঝিনুকের কাজ করা একটি নস্যদানী বৃদ্ধের হাতে দিয়ে বললে—বাবা পাঠিয়েছেন কুন্নুর থেকে—মা আসতে পারলেন না এখন—রাত্রে আবার থিয়েটারে যাবেন।

বৃদ্ধ বললেন—আজ দু'জনে বুঝি স্কুল কলেজ কামাই ক'রে ব'সে আছ? যা, ও ঘরে যা—হরিদাসকে বলে রাখ্ গাড়ির কথা। আমার এর পরে মনে থাকবে না।

তরুণী দুটি চলে যেতেই বৃদ্ধ বললেন—আমার মেজ মেয়ের মেয়ে—বাগবাজারে আমার মেজ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি। গোরাচাঁদ মল্লিকের নাম শুনেচেন তো? ওই তাদেরই বাড়ি। বনেদী বংশ—গোরাচাঁদ মল্লিক ছিলেন আমার মেয়ের শ্বশুরের···এই যে ভূধর! এসো, এসো বাবা—ব'সো।

এবার আরও গুরুতর ব্যাপার। যাঁকে সম্বোধন করা হ'ল এবং যাঁর নাম ভূধর তাঁর বয়স পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন। তিনি স্থূলকায় হ'লেও সঙ্গের মহিলাটির তুলনায় তিনি নিতান্ত কৃশ। এঁদের স্বামী-স্ত্রীর পেছনে চার পাশ ঘিরে ছ' সাতটি ছেলেমেয়ে। এদের বয়েস দশ থেকে উনিশের মধ্যে—আর একটি কুড়ি বাইশ বছরের মেয়ে একটু পিছিয়ে ছিল—তার কোলে একটি শিশু কিন্তু এ পর্যন্ত যে কয়টি মেয়ে এখানে দেখলুম, তার মধ্যে এই মেয়েটিই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী।

বৃদ্ধ তার দিকে চেয়ে বললেন—এই যে মৃণাল, পিছিয়ে কেন—আয় আয়, খোকাকে দেখি, দে একবার ভাই আমার কোলে। নিশীথ এল না?

আমার অবস্থা শোচনীয় হ'য়ে উঠেছে। ছোট ঘরে যে ফাঁকা জায়গাটুকু ছিল স্বামী-স্ত্রী তার অনেকটা অংশ জুড়ে দাঁড়িয়েছেন। বাকিটা জুড়েছে ছেলেমেয়ের দল—পেছনের মেয়েটির জন্যে তেমন জায়গা নেই, আমি সঙ্কুচিত অবস্থায় চেয়ার যতদূর সম্ভব পিছিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে দেওয়ালের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছি। জড় পদার্থকে আর সঙ্কুচিত করা সম্ভব নয়। অথচ এই ভিড়ের

মধ্যে দিয়ে ঠেলে যে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে এদের স্থানের সঙ্কুলান করবো তাও অসম্ভব। এরা আমাকে সঙ্কোচের হাত থেকে শীঘ্রই অব্যাহতি দিলেন—এই জন্যে যে পেছনে আর একদল এসে ঘরের বাইরে অপেক্ষা করছে, এরা না বেরুলে তারা ঢুকতে পারে না। এরা তো প্রত্যেকে এক-একটা তোড়া দিয়ে গেল—ছুটি মেয়ে আবার ছুটি বেলের গোড়ে বৃদ্ধের গলায় নিজেরা পরিয়ে দিলে—বৃদ্ধ কি একটা ঠাট্টাও করলেন। আমার তখন শোনবার মতো অবস্থা ছিল না। তারা ঘর থেকে বা'র হয়ে গেলে বৃদ্ধ বললেন—এই আমার বড় ছেলে তারক, আলিপুরে প্রাক্‌টিস্ করে, বালিগঞ্জে বাড়ি করেছে, সেখানেই থাকে। পিছনের দলটির মধ্যে মহিলা নেই—তিনটি ছোকরা, বয়সে ষোল থেকে একুশ, এরা এসে কিছু দিলে না, একজন অটোগ্রাফের খাতা বার করে বললে—জেঠামশায়, আমার খাতায় আজকের দিনে কিছু লিখে দিন। অটোগ্রাফের খাতা ফেরত দিতে না দিতে আর ছুটি ছেলে, তাদের সঙ্গে বারো তেরো বছরের একটি বেণী দোলানো মেয়ে।

তারপরে ব্যাপারটা গণনার বাইরে চলে গেল।

কত ছেলে-মেয়ে, তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া যে ঘরটায় ঢুকতে বেরুতে লাগল, আমার আর তাদের হিসেব রাখা সম্ভব হ'ল না। ফুলে ফুলে তক্তাপোশটা ছেয়ে গেল, ফুলের তোড়া ক্রমশ উঁচু হ'য়ে উঠতে লাগল—আর সেখানে জায়গা দেওয়া যায় না। আর এরা সবাই আত্মীয়-আত্মীয়া, বাইরের লোক কেউ নেই। সব আপনা-আপনির মধ্যে, পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, জামাই, ভ্রাতৃবধূ, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী—ইত্যাদি ইত্যাদি। ভদ্রলোক ভাগ্যবান, এঁদের মতো লোকের সাহায্য

না পেলে প্রজাপতির সৃষ্টি রক্ষা অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ত। ক্রমশ ভিড় বাড়চে দেখে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম, আমি তখন হাঁপিয়ে উঠেছি। ভদ্রলোকও গোলমালের মধ্যে আমাকে তখন ভুলে গিয়েছেন। আমি তখন বাড়ির বাইরে এসে হাঁপ্‌ ছেড়ে বাঁচি। বাড়ির সামনের গলিতে সারবন্দী মোটর দাঁড়ানো—সেখানে ধরেনি, গলি ছাপিয়ে মোটরের সারি বড় রাস্তায় এসে পৌঁছেচে, বিয়ে বাড়িতেও এত মোটর জমে কি-না সন্দেহ। গলি পার হ'য়েই বড় রাস্তার মোড়ে নিবারণ মিত্রের সঙ্গে দেখা—সে আমার পরিচিত বন্ধু, সেজেগুজে সিল্কের পাঞ্জাবি শুঁড়ওয়ালা নাগরা পরে তাকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে গলিতে ঢুকতে উদ্যত দেখে বললুম, ওহে, তুমিও কি বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি যাচ্ছো না কি?

—হাঁ। কেন বলত? তুমি বিশ্বনাথবাবুকে চিনলে কি করে?

—এতক্ষণ সেখানে বসেছিলুম ভাই, দেখে শুনে মাথা ঘুরে উঠল। শহরের এক-তৃতীয়াংশ লোক দেখলুম বিশ্বনাথবাবুর আত্মীয়-আত্মীয়া, আর তাঁরা সবাই এসেছেন ওই সাতাত্তর বছরের বুড়োর জন্মদিনে ফুলের তোড়া উপহার দিতে। তোমার তোড়া কই?

বন্ধু হেসে বললে—খুব আশ্চর্য লাগছে? বিশ্বনাথবাবুর সাত ছেলে, চার মেয়ে। এদের সকলেরই আবার ছেলেমেয়ে এবং অনেকেরই নাতি নাতনী, নাতজামাই ইত্যাদি হ'য়ে গিয়েছে। বিশ্বনাথবাবুরা তিন ভাই। তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি নাতনী আছে। হিসেব ক'রে ছাখো কত হয়—এবং আসল কথা কি জানো, বুড়োর হাতে হাজার পঞ্চাশ ষাট টাকা আছে, সকলেরই চোখ সেদিকে একথা যদি বলি, তবে সেটা খুব খারাপ

শোনাবে হয়তো। কিন্তু কথাটা মনে না উঠে কি পারে? তুমিই বলো। আচ্ছা, আসি ভাই, দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।

বিশ্বনাথবাবুর জন্মদিনের সপ্তাহ দুই পরেই আমি স্বগ্রামে গেলুম। বলা আবশ্যক যে, আমার গ্রামের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব বেশি নয়, সেখানে বছরে একবার যাওয়াও ঘটে কি-না সন্দেহ।

বাড়ি গিয়ে শুনলুম গ্রামের বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুণ মারা গিয়েছেন। শশী-ঠাকরুণের বয়স যে কত হ'য়েছিল, তা বলা শক্ত। কেউ বলে নব্বুই, কেউ বলে একশো'র কাছাকাছি হবে। আমরা মোটের উপর তাঁকে আমাদের বাল্যকাল থেকেই অতি বৃদ্ধাই দেখে আসছি। বয়সের যে গণ্ডী পার হ'য়ে গেলে মানুষের আকৃতির পরিবর্তন আর চেনবার উপায় থাকে না, শশী-ঠাকরুণ আমাদের বাল্যেই সে গণ্ডী পার হ'য়েছিলেন। শশী-ঠাকরুণের চার ছেলে, তিন মেয়ে। বড় ছেলেটি ছাড়া আর সকলেই বিদেশে চাকরি করে—বড় ছেলে তেমন লেখাপড়া না জানার দরুণ দেশে থেকে সামান্য কি কাজকর্ম করে, তার অবস্থাও ভালো নয়, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে বড় কষ্ট পায়। ভায়েরা পৃথক, কেউ কাকে সাহায্য করে না। কর্মস্থান থেকে দেশেও কেউ আসে না।

শশী-ঠাকরুণের কষ্টের অবধি ছিল না। একটা চালা ঘরে ইদানীং তিনি পড়ে থাকতেন—বড় ছেলেই তাঁর ভরণ-পোষণ করতো বটে, কিন্তু তেমন আগ্রহ ক'রে করতো না। অর্থাৎ তার মনের মধ্যে এ ভাবটা জেগে রইতো যে, মা তো আমার একার নয়—সকলেরই তো কিছু কিছু সাহায্য করা উচিত মাকে—তারা যদি না করে আমিই বা কেন এত দায় ঘাড়ে করতে যাই?

শশী-ঠাকরুণের অন্য ছেলেরা কখনো সন্ধান নিত না—বুড়ী বাঁচল, কি মোলো। অথচ তাদের সকলেরই অবস্থা ভালো—মাইনে কেউই মন্দ পায় না, শহরে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকে। বড় ভাইয়ের পত্রের জবাব দিত—তাদের নিজেদেরই অচল হ'য়েছে, শহরের খরচ থেকে বাঁচিয়ে বাড়িতে কি ক'রে পাঠায়। বাড়িতে বিষয়-সম্পত্তি তো রয়েছে—তার আয় থেকে তো মায়ের চলা উচিত—ইত্যাদি। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি এমন কিছুই না যার আয় থেকে বেকার বড় ছেলের একপাল পোষ্য ও শশী-ঠাকরুণের ভরণ-পোষণ ভালো ভাবে চলে।

বুড়ী খেতেই পেত না। ইদানীং আবার তার ছেলেমানুষের মতো লোভ দেখা দিয়েছিল—বিশেষ ক'রে মিষ্টি জিনিস খাবার। আমি সেবার যখন দেশে যাই, বুড়ী দেখি একটা কঞ্চির লাঠি হাতে মুখুয্যে পাড়ার মোড়ে বেলতলায় বসে। আমায় দেখে বললে, কুঞ্জ এলি নাকি?

—হাঁ, ঠাক্‌মা। এখানে ব'সে কেন?

—এই বাদা বোষ্টম খাবার বেচতে যাবে, তাই ব'সে আছি তার জন্যে। বাতাসা কিনব—ভিজিয়ে খাই।

—তা বেশ, বসো। ভালো আছ তো?

—আমাদের আবার ভালো থাকা-থাকি, তুমিও যেমন দাদা। খেতেই পাইনে। বাদার কাছে চারটে পয়সা ধার হ'য়েছে, আর সে ধার দিতে চায় না। সিধুর কাছে আর কত চাইব? সে নিজের ছেলেপিলে নিয়ে আথান্তরে পড়ে আছে। আহা, বাছার আমার মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়। আমি তার কাছে কিছু নিই নে।—তা তুই আমাকে আনা চারেক পয়সা দিয়ে যাবি?

বুড়ীর অবস্থা দেখে বড় কষ্ট হ'ল। পকেট থেকে একটা টাকা বার করে তার হাতে দিয়ে বললাম—এখন রাখুন ঠাক্‌মা, যখন যা দরকার হয়—আমি যতদিন বাড়ি থাকি, দিয়ে যাব আপনাকে।

বুড়ী অবাক্ হ'য়ে গেল—আনন্দে বিস্ময়ে সে যেন প্রথমটা বুঝতেই পারলে না—আমি কি তাকে সত্যি একটা গোটা টাকা দিলুম।

পরের বছর—পুজোর কিছু আগে দেশে গিয়েছি—বুড়ী দেখি আমাদের বাড়ির সামনের বাতাবি লেবুর তলার পথটা দিয়ে যাচ্ছে—হাতে একটা কাঁসার জামবাটি। আমায় দেখে বললে—কখন বাড়ি এলি ?

বললুম—কাল এসেচি ঠাক্‌মা। বাটি হাতে কোথায় গিয়েছিলেন ?

—আর বলিস্‌নে, দাদা! বাটিটা নাপিতবাড়ি নিয়ে গিয়েছিলাম যদি ওরা কেনে। আমার দিন তো আর চলে না, হাতে মোটে পয়সা নেই। সিধু খুলনে গিয়েছে—আজ চার-পাঁচদিন। বাড়ি একেবারে অচল। ছেলেপিলেগুলো খেতে পায় না এমন অবস্থা।

—তা বাটিটা বিক্রি ক'রে আর ক'দিন যাবে ঠাক্‌মা ?

—তবু যে ক'দিন যায়। তাও ওরা নিলে না—বলে এখন নগদ দিতে পারব না। ধারে বাটি দিলে আমার কি করে চলে ভাই বলো তো? একটু গুড় খেতে পাচ্ছিনে, বাটিটা বেচে ভেবেছিলাম আজ হাটে আধসের ভালো আকের গুড় আনতে দেব—আর আজকের হাটটাও হবে এখন। ছেলেপিলে শুধু ঝিঙে ভাজা আর ভাত খেয়ে মারা গেল। তা নিবি

দাদা বাটিটা?—ফুল কাঁসা, এ ওদের বাটি না। আমার নিজের বাটি—বিয়ের দানে আমার বাবা দিয়েছিলেন, ছাখ্ না?

শহরে থাকি,—অনেক সময় কাঁচা পয়সা রোজগার করি। পাড়াগাঁয়ে যে এত পয়সার কষ্ট তা ভেবে দেখি নে। আমায় অন্যমনস্ক দেখে বুড়ী ভাবলে বোধ হয় বাটি কিনবার ইচ্ছে নেই আমার। অনেকটা মিনতির সুরে বললে—না কিনিস্, ওটা বাঁধা রেখে আমায় বরং আট আনা পয়সা দে।

এ রকম অবস্থায় বুড়ীকে আমি আরও কয়েকবার দেখেছি।

শুনলাম—বুড়ীর মরণকালে ছেলেরা কেউ আসেনি—বড় ছেলে খুব সেবা-যত্ন করেছিল। বুড়ীর গায়ে একটা লেপ ছিল, মরণের ঘণ্টা দুই আগে বুড়ী পুত্রবধূকে বলেছিল—বৌমা, লেপটা সরিয়ে নাও, চার-পাঁচ টাকা দামের লেপটা—আমি বাঁচব না, তখন ওটা আমার সঙ্গে ফেলে দিতে হবে। ও গেলে আর হবে না বৌমা। আহা, কোথায় পাবে সিধু যে, আবার চার-পাঁচ টাকা খরচ ক'রে লেপ বানাবে? শীতকালে বাছারা আমার আদুড় গায়ে কাটাবে তা হ'লে।

আরও খানিক পরে বুড়ী ছেলেকে ডেকে বললে—ছাখ্ সিধু, একটা কথা বলি, শোন্। আমার শ্রাদ্ধে বেশি কিছু খরচপত্র করতে যাসনে যেন। বিধু, মণি, শরৎ ওরা কেউ কিছু হয়তো দেবে না—তুই একা পাবি কোথায় যে খরচ করবি? নমো নমো করে অমনি পাঁচটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দিবি। আর যদি ওরা কেউ কিছু পাঠায়, তাও সব টাকা খরচ করিস্ নে। হাতে কিছু রাখবি,—এর পরে তোর ছেলে-পিলেরা খেয়ে বাঁচবে।

শুনলাম শশী-ঠাকরুণের ছেলেরা সবাই বাড়ি এসেছে ও খুব ঘটা করে মায়ের শ্রাদ্ধ করছে।

বেড়াতে বেড়াতে ওদের বাড়ির দিকে গেলাম। সামনের উঠানে নারিকেলের ডাল পুঁতে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধের মণ্ডপ তৈরি করা হ'য়েছে—মণ্ডপের সামনে সামিয়ানা টাঙানো। গ্রামের অনেকেই সেখানে উপস্থিত, সেজ ছেলে গোপেশ্বর কাছা গলায় গ্রামের বৃদ্ধ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আফিসে নূতন লোক ঢোকানো আজকাল যে কত অসম্ভব হ'য়েছে—সে সম্বন্ধে কি বলচে। গোপেশ্বরের বয়েস পঁয়তাল্লিশ ছাড়িয়েছে, রেলের অডিট আফিসে বড় চাকুরি করে—চৌধুরী মহাশয় বোধ হয় তাকে কারো চাকুরির জন্যে ব'লে থাকবেন, কথার ভাবে তাই মনে হ'ল।

—আগে অনেক ঢুকিয়েছি কাকাবাবু, সিমসন গিয়ে পর্যন্ত আর সেই সুবিধে নেই। সিমসন সাহেব, আমি যা বলেছি তাই করেছে। এখন পোস্ট খালি হ'লে সব তলায় তলায় ঠিক হ'য়ে যায়—আপিসের আর সেই দিন নেই। শুনলাম গোপেশ্বর রিটায়ার করবার পরে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের দরুণ প্রায় আঠার উনিশ হাজার টাকা পাবে, হাওড়ায় না বরানগরে জমি কিনেছে, সেই খানেই বাড়ি করবে। আজ দশ-এগারো বছরের পরে সে দেশে এসেছে, মায়ের মৃত্যু না ঘটলে, আরও কতদিন আসতো না তাই বা কে জানে?

ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকে আমি অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। এদের বাড়িতে যে এত ছেলে-মেয়ে, বৌ, ঝি-চাকর আছে—তা চোখে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করবার জো ছিল না। মেজ, সেজ ও ছোট ছেলের বৌয়েরা এসেছে, তাদের ছেলেমেয়ে, নাতি, নাতনীতে বাড়ি ভর্তি। খুব ছোট বেলায় যে মেয়েদের দেখেছিলাম, হয়তো অনেকের সঙ্গে খেলাও করেছি—তাদের বিয়ে হ'য়ে

ছেলেপিলে হয়ে গিয়েছে—অনেকের স্বামীরাও এসেছে। তবু তো বুড়ীর বড় মেয়ে অনেক দূর থাকে ব'লে আসতে পারেনি—অপর দুই মেয়ে ও তাদের ছেলেমেয়েরা এসেছে। সবাই ব্যস্ত-সমস্ত, এখানে তরকারি কোটা হ'চ্চে, ওখানে জিনিসের ফর্দ হ'চ্ছে, বাড়িময় ছেলেমেয়েদের চিৎকার, হাসি, ছোটাছুটি—মেয়েরা এ ওকে ডাকছে, মায়েরা ছেলেপিলেদের বকছে, কুয়োতলায় বড় বড় পেতলের গামলা মাজার শব্দ, বাড়িসুদ্ধ সবাই শশব্যস্ত, কারো হাতে একদণ্ড সময় নেই।

—ওরে ও ঝি, রেণুর গায়ের জামাটা ছাড়িয়ে নিয়ে কেচে দেনা বাপু, কতক্ষণ থেকে বলছি, আমার কি সব সময় সব কথা মনে থাকে?

—ও কমলা, হেলে দুলে বেড়াচ্ছ মা, ততক্ষণ পানগুলো তুমি আর বীণা নিয়ে ধুয়ে ফেল না—এরপর আর সময় পাবে?···কি—কি—আবার মরছে ডেকে ছোট বৌ—মাগো, হাড় জ্বালালে—বস্‌তে দেয় না একরত্তি—এই তো আসছি ভাঁড়ার ঘর থেকে—

একটি সতরো-আঠারো বছরের সুন্দরী মেয়ে দালানে ঢুকবার দরজায় এক পাশে একটা স্টোভ ধরাবার চেষ্টা করছে—আমি পাশ কাটিয়ে দালানের মধ্যে ঢুকে দেখি—মেজ ছেলে বীরেশ্বর ও তার বৌয়ে ঝগড়া হ'চ্ছে। মেজ ছেলে কোন জমিদারী ষ্টেটের ম্যানেজার, বয়েস পঞ্চাশের ওপর—তার স্ত্রীকে আগে কৃশাঙ্গী দেখেছি, আজ আট ন' বছর দেখিনি—এত মোটা হয়েছেন যে এরি মধ্যে প্রথমটা যেন চিনতেই পারি না। হাতে মোটা সোনার বালা ও অনন্ত, গলায় ছিকলি হার। তিনি স্বামীকে বলছেন—ও ঘরে আমি থাকতে পারব না, এই ভিড়, তাতে ও ঘরে খিল নেই। আমার মেয়ের গায়ে এক গা

গয়না, কাজের বাড়ি, লোকের ভিড়—বিশ্বাস আছে কাউকে—তাতে এই পাড়াগাঁ জায়গা। বাবা, ভালোয় ভালোয় কাজ মিটিয়ে এখন এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। কাল সারারাত মশায় খেয়েছে।

বীরেশ্বর বলচে, তা তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে না হয় পশ্চিমের কোঠায় শুয়ো—মাথা গরম কোরোনা, দোহাই তোমার—তোমার মাথা গরম আমার বরদাস্ত হয় না বাপু—

আমি ঢুকে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে বললুম—চিনতে পারেন কাকীমা?

তিনি কথার উত্তর দেবার পূর্বেই এগারো বারো বছরের একটি মেয়ে কোথা থেকে ছুটে এসে বললে—নাথ্নি এখনও পিণ্টুকে দুধ খাওয়ায়নি মা—সকাল থেকে তাকে নিয়ে বাইরের উঠোনে বসে আছে—বললেও শুনচে না—

বীরেশ্বর বললে—যা এখন যা, বলগে যা নাথ্নিকে—আমি ডাকছি। এসো কুঞ্জ বসো। ওগো তুমি কুঞ্জকে চিনতে পারলে না?

বীরেশ্বরের স্ত্রী মৃদু হাস্যে বললে—দেখেছি বোধ হয় ওকে ছেলেবেলায়, যাতায়াত নেই—দেখাশুনো তো হয় না, না চিনবার আর দোষ কি বল? শাশুড়ী মারা না গেলে কি এখন আসা হ'ত? চিঠি পেয়ে আমি বলি—না যেতে হবে বই কি, দেশে একটা মানখাতির আছে। শাশুড়ীর কাজটা ভালো করে না করলে লোকে ওঁদেরই দুষবে। বট্‌ঠাকুরের পয়সা নেই সবাই জানে। ওঁদের গাঁয়ে ঘরে নাম রয়েছে, দেশে-দেশে সবাই মানে, চেনে, বলবে—অমুক বাবুর মায়ের শ্রাদ্ধে কিছুই করেনি, বলত বাবা, কথাটা কি শুনতে ভালো?……তাই তো এলুম

নইলে এসব জায়গায় কি মানুষ আসে? কি মশা! কাল রাত্তিরে একদণ্ড চক্ষের পাতা বুজতে দেয়নি।

রোয়াকের ধারে বসে মেজ ভাইয়ের ছেলে বিকাশ তাদের স্কুল কি ভাবে একটা ফুটবল-ম্যাচ্ জিতেছে, মহাউৎসাহে সে গল্প করছে সেজ ভাইয়ের ছেলে বিনুর কাছে। বড় ভাইয়ের ছেলে ভোলা অবাক্ দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে চেয়ে এক মনে গল্প শুনছে। তার বয়েস ওদের চেয়ে যদিও বেশি, কিন্তু জীবনে কখনো সে গাঁয়ের আপার প্রাইমারী পাঠশালা ছাড়া অন্য স্কুলের মুখ দেখেনি। এদের কাছে সে সর্বদা কুণ্ঠিত হ'য়ে আছে। শুধু ভোলা নয়—ভোলার মাকেও লক্ষ্য করলুম,—জায়েদের বড়মানুষি চালচলন ও কথাবার্তার মধ্যে নিতান্ত সঙ্কুচিত হ'য়ে আছে। জায়েরা বড়মানুষি দেখাবার জন্যে প্রত্যেকে ঝি, চাকর এনেছে, তাদের কাছেও যেন ও-বেচারী কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত।

হঠাৎ কোথা থেকে বিকাশের ছোট দিদি আরতি ঝড়ের মত এসে বললে—এই যে এখানে বসে গল্প হচ্ছে ছেলের। ওদিকে কাকীমা, দিদি—সব ডেকে ডেকে হয়রান, চা হ'য়ে গেছে, খেয়ে এসে সবারই মাথা কেনো, যাও—

ওকে দেখেই আমার একটা ছবি মনে এসে গেল। বৃদ্ধা, মাজা বাঁকা, গাল তোবড়ানো শশী-ঠাকরুণ কাঁসার বাটি বিক্রয় করতে গিয়ে নিরাশ হয়ে ফিরছে নাপিত-বাড়ি থেকে। এই হাসিমুখ বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, তরুণী—এদের সৌন্দর্য, সজীবতা, আনন্দ, যৌবন—এদের সৃষ্টি করেছে সেই দরিদ্রা বৃদ্ধা শশী-ঠাকরুণ—এরা তারই বংশধর—তারই পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, আজ তার মৃত্যু-বাসরে এই যে চাঁদের হাট বসেছে—এতদিন এরা ছিল কোথায়? এরা থাকতে বুড়ী

কেন খেতে পেত না, কেন চোখের জলে তার বুক ভেসেছে —তার কোন উত্তর নাই।

সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার সেই বাড়িওয়ালা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাড়ির উৎসবের কথাও মনে পড়ে গেল। এইরকমই অগণিত পুত্র, কন্যা, পৌত্র, দৌহিত্রীর, দৌহিত্র ভিড় দেখেছি সেখানেও। সবই সেইরকম—কেবল সেটা ছিল জন্মতিথি উৎসব—জন্মতিথি যার, তার বয়েস শশী-ঠাকরুণের মতোই প্রায়।

## সই

দুপুরে বাসায় শুইয়া আছি, এমন সময়ে উচ্ছলিত খুশি ও প্রচুর তরল হাস্যমিশ্রিত তরুণ কণ্ঠস্বরে শুনিতে পাইলাম, ও সই, সই লো—ও—ও, ক্যামন আছ, ও সই ?

পাশের ঘর হইতে আমার ভগ্নি (বিধবা, বয়স ত্রিশের বেশি) হাসির সুরেই বলিল, এস সই, এস। ব'স, কি ভাগ্যি যে এ পথে এলে ?

—এই তোমার সয়া হাট কত্তি এল। নতুন গুড়ের পাটালি সের দুই করেলো আজ বেন্ বেলা। ছোট ছেলেডার আবার জ্বর আর ছর্দি। তাই তোমার সয়াকে হাটে পাঠালাম, আমি বলি সইয়ের সঙ্গে কতদিন দেখা হই নি। ছেলেডাকে নিয়ে আর হাটের ভিড়ের মধ্যে ক'নে যাব, সইয়ের বাড়ি একটু বসি।

কথার ভঙ্গিতে মনে হইল দুলে কি বাগ্দীদের মেয়ে। আমার বোনের সহিত সই পাতান তাহার পক্ষে আশ্চর্য নয়, কারণ তাহারও শ্বশুরবাড়ি নিকটবর্তী এক পল্লীগ্রামেই। ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার সুবিধার জন্য শহরের বাসায় থাকে।

দুপুরের ঘুম নষ্ট হইল। বোনের নবাগতা সঙ্গীটি লেখাপড়া ভালো করিয়া শিখিলে এ্যানি বেসাণ্ট হইতে পারিত। মুখের তাহার বিরাম নাই। অনবরত বকিয়া যাইতেছে, এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে ছেদস্বরূপ বলিতেছে, সই একটা পান দেবা ?…দোক্তা খাও না ? তা ছ্যাও একটা এমনি পানও

দ্যাও। ও হাবলা, এই তোর সেই সই-মা, চিনতে পেরিলি, হ্যাঁরে বোকা ছোঁড়া? গড় করলি নি যে সই-মাকে? নে, পায়ের ধুলো আর নিতি হবে না, এমনি গড় কর।

পান খাইয়া সে আবার শুরু করিল, ঘরের কত ভাড়া দ্যাও, হ্যাঁ সই? তের টাকা? ও মা, ক'নে যাব। তা কি দরকার তোমার শহরে এত টাকা খরচ করে থাকবার, হ্যাঁ সই? দিব্যি তোমার ঘরডা বাড়িডা রয়েচে গেরামে। আম কাঁঠাল গাছ-গুলো দেখা অবানে নষ্ট হয়ে যাবে। ন্যাও সই, মেয়ে যেন তোমায় চাকুরি করে নিয়ে খাওয়াবে লেখাপড়া শিখে, হি হি—হি হি—বলিয়া সে হাসিয়া লুটাইয়া পড়ে আর কি!

আমার শোবার ঘরের বাহিরের রোয়াকে তাহার হাসি ও বক্তৃতা চলিতেছে, তা-ও এমন উচ্চকণ্ঠে যে, কলিকাতা শহরে হইলে ফুটপাথে ভিড় জমাইয়া যাইত। আমি একে কাল রাত্রে মশার উপদ্রবে তেমন ঘুমাইতে পারি নাই, এমন বিপদও আসিয়া জুটিল ঠিক কিনা দুপুর বেলাতেই। ছোট বাসা, অন্য কোন ঘরও নাই যে সেখানে গিয়া ঘুমাই।

—ও সই ছেলেডাকে একটু জল দ্যাও দিকিন্, অনেকক্ষণ থে খাবে বলেচে। তা ওর আবার লজ্জা দেখলে হয়ে আসে! জল চা'বি তোর সই-মার কাছে, তার আর লজ্জা দেখ না ছেলের?

আমার বোন জল আনিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিলে সে চুপিচুপি তাহার ছেলেকে আশ্বাসের সুরে বলিতেছে শুনিলাম—তোর সই-মা কি তোরে এমনি জল দেবে? কিছু খাতি দেবে অখন দেখিস্। দেখি? পেটটা পড়ে রয়েচে, অ মোর বাপ, সেই সকালে দুটো পান্তা খেয়োলো, আহা। পাটালি হাটে বিক্রি

হলি চাল কিনে নে যাব, এ-বেলা ভাত রাঁধব অখন। এখন তোমার সই-মা যা খাতি ছায়, তাই খেয়ে থাক। পয়সা নেই যে, মাণিক।

এই সময় আমার বোন জল এবং বোধ হয় বাটিতে একটু গুড় লইয়া রোয়াকে গিয়া উপস্থিত হইল—কারণ শুনিলাম সে ছেলেটিকে বলিতেছে—নে, হাবলা, হাত পাত, গুড়টা খেয়ে জল খা। শুধু জল খেতে নেই।

হাবলা ও হাবলার মা যে একটু নিরাশ হইয়াছে, ইহা আমি তাহাদের গলার স্থর হইতেই অনুমান করিলাম। হাবলার মা নিরুৎসাহভাবে বলিল, নে, গুড়টুকু হাতে নে। খেয়ে ফেল্। যেন রোয়াকে না পড়ে—

ঠিক দুপুরের পরই সময়টা, এখন যে কিছু খাইতে দেওয়া প্রয়োজন, এ-কথা আমার বোনের মাথায় আসে নাই বুঝিলাম। তা ছাড়া পল্লীগ্রামে এ-রকম নিয়মও নাই।

—ভালো কথা সই, তোমার জন্যি ভালো নঙ্কার বীজ এনেলাম। এই মোর আঁচলে বাঁধা ছেলো, তা রাস্তার মাঝখানে কোথায় পড়ে গিয়েচে। বাসায় জায়গা আছে গাছপালা দেবার? আসচে হাটবারে আবার নিয়ে আসব।

এই সময়ে আমার ছোট ভাগ্নে স্কুল হইতে ফিরিল। টিফিনের ছুটি হইয়াছে, সে সকালে খাইয়া থাকিতে পারে নাই বলিয়া ভাত খাইতে আসিয়াছে।

—ও টুলু, চিনতে পার তোমার সই-মারে? হি হি, ও মা ছেলে এন্নি মধ্যে কত বড় হয়ে গিয়েচে মাথায়। গায়ে এটা কি, জামা? বেশ জামাটা।

আমার ভাগিনেয় এই বয়সেই একটু চালবাজ। গ্রাম হইতে

আগত এই সই-মাকে দেখিয়া সে যে খুব খুশি হইয়া উঠিয়াছে, এমন কোন লক্ষণ তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। তাহার সই-মা বলিল, বেশ জামাটা টুলুর গায়ে। টুলুর আর কোন ছেঁড়া-কাটা জামা-টামা নেই, হ্যাঁ সই? ছেলেডা এই শীতি আদুড় গায়ে থাকে। তোমার সয়া এবার অসুখে পড়ে গাছ কাটতে পারে নি। মোটে দশটা গাছে যা রস হয়, তাই জ্বাল দিয়ে সের আড়াই পাটালি হয়। হাট্‌রা হাটে পাটালির দর নেই, তার ওপর ছ' পয়সা আট পয়সা সের। ওই থেকে চাল ডাল, ওই থেকে সব। গাছের আবার খাজনা আছে। ছেলেডাকে একখানা দোলাই কিনে দেব দেব ভাবচি আজ তিন হাট, কোথা থে দেই বল দিকিন সই? কি রে—কি? হুঁ, উ উ? ছেলের আবার আবদার দেখ না?

আমার বোন বলিল, কি? কি বল্‌চে হাবুল?

—ওর কথা বাদ ছাও সই। রাস্তা দিয়ে ওই যে মিন্সে চিনির কি বলে ও-গুলো—

হাবুল বলিল—গোলাপছড়ি।

—তা যে ছড়িই হোক, ওই ওঁকে কিনে দিতে হবে। না, ও খায় না। কি ছড়ি? গোলাপছড়ি? হি হি, নাম দেখ না?—গোলাপছড়ি।

আমার ভাগ্নের দৃষ্টিও বোধ হয় ইতিমধ্যে গোলাপছড়ির দিকে পড়িয়াছিল। সে ছুটিয়া গিয়া ফিরিওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল ও আমায় সটান আসিয়া বলিল—গোলাপছড়ি কিনব, মামা। পয়সা দাও।

বোধ হইল হাবুলও কিছু ভাগ পাইয়াছে, কারণ একটু পরেই হাবুলের মায়ের খুশিভরা গলার সুর শুনিতে পাইলাম—

ন্যাও, হ'ল তো? কেমন বেশ মিষ্টি? খাও। পাটালির চেয়ে কি বেশি মিষ্টি? দেখি দে তো একটু গালে দিয়ে? কি জানি, এ-সব কখনও দেখিও নি চক্ষে।

একটু পরে টুলুকে ভাত দিতে তাহার মা রান্নাঘরে চলিয়া গেল। সেই সময়ে শুনিলাম, হাবুল নাকিস্সুরে বলিতেছে, না, মা, হুঁ। আর তোমারে দেব না। আমি তবে কি খাব?

হাবুলের মা তাহার সইকে আর পাইল না, কারণ ছেলেকে খাওয়াইয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিয়া নিজে ঘরের মধ্যে বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে। অনুপস্থিত সইয়ের উদ্দেশ্যে হাবুলের মা আপন মনে অনেক গল্প করিয়া গেল। খানিক পরে শুনিলাম বলিতেছে—ওই সই, ক'নে গেলে? ঘুমুলে না কি? মোরে আর একটা পান দেবা না?

কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না।

বেলা তিনটা বাজিয়াছে। আমি বেড়াইতে বাহির হইতে গিয়া দেখি অতিমলিন শাড়ি পরনে এক বাইশ তেইশ বছরের কালো-কোলো মেয়ে একটা চুপড়ি পাশে রাখিয়া ঠিক পৈঠার কাছে বসিয়া আছে। তার ছেলেটিও কাছে বসিয়া তখনও গোলাপছড়ি চুষিতেছে। আমাকে দেখিয়া মেয়েটি থতমত খাইয়া মাথায় ঘোমটা তুলিয়া দিল। দুপুরের বিশ্রামের ব্যাঘাত হওয়ায় মনটা বিরক্ত ছিল, একটু রুক্ষ সুরেই বলিলাম—একটু সরে ব'স পথ থেকে। চুপড়িটা রাস্তার ওপর কেন?

মেয়েটি ভয়ে ও সঙ্কোচে জড়সড় অবস্থায় চুপড়ি সরাইয়া এক পাশে রাখিয়া নিজে যেন একেবারে মাটির সহিত মিশিয়া গেল।

সন্ধ্যার কিছু আগে উকীলদের ক্লাবে টেনিস খেলিয়া বাসায়

ফিরিতেছি, দেখি বাসার পাশে বড় রাস্তার ধারে তুঁততলার শুকনো পাতার উপরে আমার বোনের সই তাহার ছেলেটিকে লইয়া বসিয়া আছে। পাশে সেই চুপড়ি ও একটা ছোট ময়লা কাপড়। সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই, তুঁতগাছের মগডালেও আর রোদ দেখা যায় না। হাবুলের বাপ এখনও পাটালি বিক্রি করিয়া হাট হইতে ফিরে নাই। মেয়েটি যেন কেমন ভরসা-হারা নিরাশ মুখে বসিয়া আছে, অন্ততঃ তেমন হাসিখুশির ভাব আর দেখিলাম না।

## রামশরণ দারোগার গল্প

রামশরণবাবু আমাদের সান্ধ্য-আড্ডায় নিত্যই আসেন, কিন্তু কথাবার্তা বড় একটা বলেন না। তিনি একজন অবসর-প্রাপ্ত পুলিশের কর্মচারী, জীবনে অনেক জিনিসই দেখেছেন,—আমাদের অনেকের চেয়ে বেশি দেখেছেন। কিন্তু তিনি এসেই একটা তাকিয়া আশ্রয় ক'রে সেই যে আড় হয়ে শুয়ে পড়েন, আর যতক্ষণ না আড্ডার শেষ লোকটি চলে যাবে—ততক্ষণ তিনি চোখ বুজে এবং নিজে নির্বাক থেকে অন্য সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই মেয়েদের প্রেম ও তার মূল্য—এই ধরনের একটা আলোচনা চলছিল। এ সম্বন্ধে যার যা অভিজ্ঞতা সকলেই কোন-না-কোন ঘটনা বলছে। রামশরণবাবু তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে চোখ বুজেই বলে উঠ্লেন, আমার চাকুরী-জীবনে একটা ব্যাপার একবার ঘটেছিল, অনেকদিন হলেও এখনও ভুলিনি। আরও ভুলিনি এই জন্যে যে ব্যাপারটা আমার কাছে একটা সমস্যার মতো চিরকাল রয়ে গিয়েছে, যদিও কত জটিল সমস্যারই মীমাংসা করে বেড়িয়েছি সারা জীবন! বলি শুনুন ঘটনাটা।

আমি তখন থাকি আলমপুর থানায়। কলকাতার অত কাছে, বড় শহরের উপকণ্ঠে, চুরি জুয়াচুরির আড্ডা বেশি—একথা পুলিশ-কর্মচারী মাত্রই জানেন। এক মাসের মধ্যে কলকাতা পুলিশ থেকে অন্ততঃ সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—আমাদের

এলাকায় কোন বাগান-বাড়িতে একজন নোট জাল করছে, তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি কি না। আর সাত বার জিজ্ঞেস করে পাঠাল—বাগান-বাড়িতে বোমার কারখানা বসেছে, আমরা সে বিষয়ে কি খবর রাখি। ফেরারী আসামী ত হরদম পালিয়ে এসে আড্ডা নিচ্ছে আমাদের এলাকায়! একবার ত মুরশিদাবাদ জেলা থেকে—কে কার মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এসে লুকিয়ে রইল থানারই পাশে আমাদের নাকের কাছে—এক খোলার ঘরে। তা ছাড়া বে-আইনী কোকেন্, গুম, টাকা জাল, চোরাই মালের ব্যবসা, গুণ্ডামী প্রভৃতি প্রত্যেক হাঙ্গামার সঙ্গেই কি আলমপুর থানার এলাকাভুক্ত বাগান-বাড়ি ও বস্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক?...অনুসন্ধান করলে দেখা যায়—শতকরা নব্বুইটা হয় সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, নয়ত আলমপুর থানার ত্রিসীমানায় উক্ত দুর্বৃত্তের দল কখনো পদার্পণ করে নি, তবুও কলকাতা পুলিশের এনকোয়ারী স্লিপের ভিড়ে আমাদের প্রাণ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠত!

একদিন দুপুরের পর তেমন কাজকর্ম নেই, আমি রোদ পিঠে করে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। শীতকাল। এমন সময় গাড়ির শব্দে মুখ তুলে চেয়ে দেখি—একখানা সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ি থেকে একজন স্ত্রীলোক থানার সামনেই নামছেন। তিনি থানার মধ্যে ঢুকে, আমাকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—

দারোগাবাবু কোথায়?

বলুন—আমিই।

তখন তিনি একখানা খামের চিঠি আমার হাতে দিলেন। খাম খুলে চিঠিখানায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্ত্রীলোকটিকে বসতে বললুম। চিঠি লিখছেন নারী-কল্যাণ-আশ্রমের বিখ্যাত

কর্মী শ্রীযুক্ত যোগেশ চক্রবর্তী। যোগেশবাবু আমার পরিচিত পুরাতন বন্ধুও বটে। তাঁর দ্বারা স্ত্রীলোকঘটিত নানা ঘটনায় পুলিশের অনেক উপকারও হয়েছে বটে। তাঁর বর্তমান পত্রে বিশেষ কিছু লেখা নেই, মাত্র এইটুকু যে, যিনি এই পত্র নিয়ে যাচ্ছেন, তিনি যোগেশবাবুর পরিচিতা; তার বক্তব্য কি, তা শুনে আমি যদি তাকে সাহায্য করি,—তবে ভালো হয়। আমরা পুলিশের লোক—কাউকে বিশ্বাস করা আমাদের অভ্যাস নয়। মানুষের চরিত্রের খারাপ দিকটা এত দেখেছি যে—এতে আমাদের দোষ দেওয়া খুব বেশি চলে না।

স্ত্রীলোকটিকে একবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখে নিয়ে মনে হ'ল তাঁর বয়েস চল্লিশের মধ্যে হবে। এক সময়ে খুব রূপসী ছিলেন। খুব সরল চরিত্রের মেয়ে নয়—একটু খেলোয়াড় ধরনের। অবস্থাও খুব ভালো নয়।

জিজ্ঞেস করলুম—আপনি কি চান?

তিনি উত্তরে যা বললেন, সংক্ষেপে তার মর্ম এই যে—এখানকার কোন কালী-মন্দিরের পূজারীর সঙ্গে তাঁর একমাত্র মেয়ের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় তাঁর অবস্থা খুব ভালো ছিল না বলেই ওরকম পাত্রে মেয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। মেয়েটি বড়ই কষ্টে আছেন। তিনি বর্তমানে মেয়েকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান—তাঁর নিজের কাছে। যোগেশবাবুর সাহায্যে মেয়েটিকে কোথাও লেখাপড়া কি নার্সের কাজ শেখাবার ব্যবস্থাও করতে পারেন; মোটের উপর মেয়েকে তিনি এখানে রাখতে রাজী নন, এ বিষয়ে আমাকে তাঁর সাহায্য করতে হবে।

এত সংক্ষেপে তিনি কথাটা আমায় বলেন নি। স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি খুব। তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাসও কিছু কিছু

ওই সঙ্গে আমায় শুনে যেতে হ'ল। তার মধ্যে ছটো কথা প্রধান। এক সময়ে তাঁর স্বামীর কত টাকা ছিল এবং তিনিও দেখতে এঁর চেয়ে অনেক ভালো ছিলেন।

আমি বললুম—পুলিশের সাহায্য চান কেন? আপনি নিজেই কেন গিয়ে জামাইকে বলুন না?

তিনি বললেন—অনেকবার বলেছি, জামাই শোনে না, মেয়ে পাঠাবার মত নেই, অথচ তার ছর্দশার একশেষ করছে। আপনি নিজের চোখে গিয়ে দেখলেই সব বুঝবেন। আমি মেয়েমানুষ, আমার কোনো জোর খাটবে না তো, আমার সহায় নেই, সম্পত্তি নেই, কে আমার পক্ষ হ'য়ে ছটো কথা বলবে? তাই যোগেশবাবুকে ধরে আপনার কাছে আসা।

আমি বললুম—দেখুন, এতে পুলিশের কিছু করবার নেই। বিবাহিতা স্ত্রীকে রাখবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে স্বামীর। আপনার জামাই যদি মেয়েকে না আপনার সঙ্গে দেন, আমরা তাতে কি করব?—আপনার মেয়ের মত কি?

স্ত্রীলোকটি একটু ইতস্ততঃ করে বললেন—মেয়েরও মত নয় এখানে থাকা। তারপরে কাঁদো কাঁদো সুরে বললেন—আমার এই উপকারটুকু করুন আপনি। মেয়েকে আমি নিয়ে যাবই। তার কষ্ট আর দেখতে পারিনে। আপনি একটু সহায় না হলে—আমার আর কোনো উপায় নেই—এটুকু দয়া করে, আপনাকে করতেই হবে। মার খেয়ে খেয়ে তার শরীরে আর কিছু নেই।

স্ত্রীলোকটির কথার বাঁধুনি আমার ভালো লাগল না। অনেক রকম লোক দেখেছি মশাই, ভালো-মন্দ সব রকম দেখে যদি একটু সিনিক হ'য়ে থাকি, তার জন্যে আমাদের বেশি দোষী ঠাওরাবেন না।

শেষ পর্যন্ত কতকটা উপরোধে পড়ে—কতকটা কৌতূহলের বশবর্তী হ'য়ে গেলাম সেই কালীবাড়ী। কিন্তু স্ত্রীলোকটিকে থানায় বসিয়ে রেখে গেলাম। কালী-মন্দিরের কাছেই ছোট্ট একতলা ঘরের একটা কুঠরীতে পূজারী-ঠাকুর থাকে, সন্ধান নিলাম। পূজারীকে খুঁজে বার করতে বেগ পেতে হ'ল না। বছর পঁয়ত্রিশ বয়েস, একহারা পাকসিটে চেহারা। এই বয়সেই চুলে বেশ পাক ধরেছে, দেখেই মনে হ'ল—নেশাখোর লোক। ধড়িবাজও বটে।

তাকে সব খুলে বললাম। পুলিশ দেখে সে জড়সড় হয়ে গিয়েছে। কাঁচু-মাচু ভাবে বললে—"আজ্ঞে বাড়িতে যদি আপত্তি না করে, আপনি গিয়ে শাশুড়ী ঠাকরুণকে নিয়ে আসুন, আমি পাঠিয়ে দেব। যদি সত্যি কথা জিজ্ঞেস করেন দারোগাবাবু, আমার মোটেই আপত্তি নেই। একটা পেট আমার, যে-কোনো রকমে চালিয়ে নেব। বেশ, আপনি চলুন আমার বাসায়। আমার স্ত্রীকে বলুন—আমি সেখানে থাকব না।"

এর পরে আমার এমন একটা অভিজ্ঞতা হ'ল, যা অতদিনের পুলিশ-জীবনে কখনো হয়নি। পূজারী যখন তার স্ত্রীকে দোর খুলতে বললে—আমরা তখন দোরের পাশে, কিন্তু অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে। দোর কে একজনে এসে খুলতেই পূজারী-ঠাকুর বললে, দুটি ভদ্রলোক এসেছেন তোমার বাপের বাড়ি থেকে,—তোমার মায়ের কাছ থেকে, ওঁরা তোমাকে কি বলবেন। ওঁদের সঙ্গে কথা বল। আমি একটু জলটল খাওয়ানোর ব্যবস্থা দেখি।

তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বললে, আসুন আপনারা,—কথাবার্তা বলুন।...আসচি আমি।

ঘরের মধ্যে আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে আধ-ঘোমটা দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে, বললে বিশ্বাস করবেন কিনা জানিনে—কিন্তু অমন অপরূপ সুন্দরী মেয়ে আমিতো মশাই আমার জীবনে খুব বেশি যে দেখেছি, এমন মনে হয় না। টকটকে গৌরবর্ণ,—মাথায় ঘন কালো চুলের রাশ, প্রতিমার মতো মুখশ্রী, কি সুন্দর হাত পায়ের গড়ন,—কি সুন্দর ছোট্ট কপালখানি। আর চোখ—সকলের চেয়ে দেখবার জিনিস তার চোখ, ডাগর ডাগর, ভাসা ভাসা, তুলি দিয়ে আঁকা টানা জোড়া ভুরু। কতদিন হয়ে গিয়েছে—এখনও সে চেহারা চোখের সামনে দেখছি।

ঘরে ঢুকে বললুম—'মা, আমাদের দেখে ভয় পেও না, লজ্জাও করো না। আমরা পুলিশের লোক। এখানকার থানা থেকে আসচি। তোমার মা খানিকটা আগে থানায় আসেন এবং আমাদের অনুরোধ করেন—তাঁকে সাহায্য করতে। তিনি তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চান। তিনি থানায় বসে আছেন। তুমি যদি যাবার মত কর, তবে তাঁকে এখানে গাড়ি নিয়ে আসতে বলি।' মেয়েটি একটিবার মাত্র ঘাড় নেড়ে বললে—আমি যাব না।

ঘরের মধ্যে চার ধারে চেয়ে দেখি—এক কোণে একটা ভাঙ্গা টিনের তোরঙ্গ। তোরঙ্গটার ওপরে একটা কাঠ-বাঁধানো পুরোনো আয়না ও একটা কাচের তেল মাখবার বাটি; এক কোণে কতকগুলো ছেঁড়া-ধুকড়ি লেপ কাঁথা। ঘরের কড়ি থেকে টাঙানো গোটা দুই দড়ির শিকে। তাতে কলাই করা বড় জামবাটি বসানো। পেতল কাঁসার চিহ্ন নেই কোথাও। দারিদ্র্যের এমন রূপ আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হ'ল না।

মেয়েটির উত্তর শুনে বললুম—মা, যদি তোমার স্বামীর

মতামতের বিষয়ে তোমার সন্দেহ থাকে, আমি বলচি তোমার মা যদি তোমায় নিয়ে যান, তোমার স্বামীর তাতে অমত নেই। আমার কাছে তিনি বলেছেন একথা। আসবার সময় সে-সব কথা হ'য়ে গিয়েছে।—কোনো ভয় নেই। নির্ভয়ে তুমি চলে আসতে পার। আর এখানে যে-কষ্টে আছো দেখচি, তাতে আমার মনে হয়—তোমার যাওয়াই ভালো।

সে এবারও ঘাড় নেড়ে বললে—না, আপনি মাকে গিয়ে বলুন—আমার যাওয়া হবে না।

সে স্বরের দৃঢ়তা এমনি যে, তার ওপর আর বিশেষ কিছু বলা চলে না। তবুও আর একবার বললুম—দেখ মা, বেশ করে ভেবে দেখো, তোমার মা এসেচেন অনেক আশা করে। আমাদের সাহায্য চেয়েচেন বলেই আমরা এসেচি। অবিশ্যি এটাও আমরা দেখবো তুমি তোমার মায়ের সঙ্গে গেলে, তোমার স্বামী তোমার ওপর কোনো রূঢ় আচরণ না করেন। সে বিষয়ে তুমি নির্ভয় থাকতে পার।

মেয়েটি মুখ নিচু করে এবারও ঠিক আগের মতো স্বরেই বললে—না, আমি যাব না।

আমার কেমন একটু রাগ হ'ল—পুলিশে কাজ করে করে একটা বদ অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—কারোর প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতাম না। একটু বিরক্তির স্বরে বললুম—এই কষ্টে থাকবে, সেও ভালো? যাবে না তবুও? মেয়েটি চুপ করে রইলো। বেশ, না যাবি মরগে যা, তাতে আমার কি? বললুম—তা হ'লে একটা কাজ কর—না যাও সে তোমার ইচ্ছে। আমাদের কিছু বলবার বা জোর করবার নেই। তুমি একখানা পত্র লেখ তোমার মাকে, যে আমরা তোমাকে যাবার জন্যে

অনুরোধ করেছিলুম,—তুমি যেতে রাজী হওনি, আমরা থানায় গিয়ে তাঁকে দেখাব।

কাগজ কলম আমরা দিলাম। মেয়েটি মেঝের ওপর বসে চিঠি লিখতে লাগল। ওর সুগৌর হাত দুটির ওপর সেই সময় ভালো ক'রে চোখ পড়তে দেখি এক জোড়া রাঙা কড় ও নোয়া ছাড়া এমন সুশ্রী সুডৌল হাতে আর কিছু নেই।

আরও কষ্ট হ'ল ঘরের মেঝের অবস্থা দেখে। কি বিশ্রী সেঁতসেঁতে মেঝে, সপসপ করছে ভিজে। সদা-সর্বদা যেন জল উঠছে। এই মেঝের ওপর বিনা খাটে শোয় কি করে—এ আমার বুদ্ধির অতীত। অত্যন্ত সুস্থ লোকও তিন দিন এ রকমের শুধু মেঝেব ওপর যদি শুয়ে থাকে, সে নিশ্চয়ই একটা কঠিন অসুখে পড়বে।

কথাটা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অবাক্ হ'য়ে চেয়ে দেখি—মেয়েটি মুখ নিচু কবে, পা ছড়িয়ে মেয়েলি ধরনে বাঁ-হাতের কনুইয়ের ওপর ভব দিয়ে একদিকে কাত হ'য়ে বসে চিঠি লিখছে আর তার ডাগর চোখ দুটি বেয়ে টস্ টস্ করে জল পড়ছে, দু' এক ফোঁটা জল চিঠির ওপরও পড়ল।

পুলিশেব চাকুরিতে মন বেশ একটু কঠিন হ'য়ে গিয়েছিল বটে, তবু মেয়েটির নিঃশব্দে কান্না দেখে, ওব সংসারের এই নগ্ন দারিদ্র্য, নিরাভরণ ওই হাত দু'টি, এই সেঁতসেঁতে ঘরের মেঝে, ভাঙা আয়নাখানা, ওই ধুকড়ি লেপ কাঁথা দেখে, তার ওপর ওর গাঁজাখোর মূর্খ স্বামীর কথা মনে হয়ে—না মশাই আপনারা বললে বিশ্বাস করবেন না—সুরটা নরম করেই বললুম—এই তো মাকে চিঠি লিখতেই তোমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তবে কেন চলনা, তাঁর সঙ্গে ?

আমার সহানুভূতির সুর বোধ হয় ওর হৃদয় স্পর্শ করলে, বললে, সেখানে এর চেয়েও কষ্ট।

ওর সেই দৃষ্টিতে হতাশা, ঔদাসীন্য, মরীয়াভাব—সব এক-সঙ্গে জড়ানো।

অবাক্ হ'য়ে বললুম—এর চেয়েও কষ্ট! এর চেয়ে আর কি কষ্ট থাকতে পারে?

মেয়েটি শান্ত, স্থির স্বরে বললে—আপনি সব কথা জানেন না, বললুম যে আরও অনেক কথা আছে এর মধ্যে! সে সব কথা বলতে চাইনে। মাকে আমার প্রণাম জানাবেন আর বলবেন, তোমার মেয়ে মরেচে আর তার খোঁজ কোরো না—

কথাটার শেষের দিকে রুদ্ধ-কান্নায় ওর গলার সুর আটকে গেল। আমিও চিঠিখানা নিয়ে সে স্থান ত্যাগ করলুম। পথে দেখি পূজারী-ঠাকুর একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে আসছে, আমাদের দেখে দাঁত বার করে বললে—'হেঁ হেঁ, কি হ'ল দারোগাবাবু? যা বলেচি, তাই হ'ল কিনা? তা এখুনি চললেন যে······? একটু যৎসামান্য মিষ্টিমুখ—'

ওর ওপর রাগ কি হিংসে—কি হ'ল জানিনে। তার সে সব আপ্যায়িতের কথা রূঢ়ভাবে মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়ে বললুম—ওসব থাক্। একটা কথা বলি শোন ঠাকুর, কাল থানায় যেয়ো সকাল বেলা। একটা তক্তাপোশ সস্তায় নীলাম হবে। দাম তুমি যখন হয় দিও, কাল গিয়ে নিয়ে এসো সেখানা। বুঝলে?

পুজারী-ঠাকুর অবিশ্যি নিজের কাজ ভোলেনি। পরদিন সকালে এসে খাটখানা নিয়ে গিয়েছিল। এই খানেই আমার গল্পের শেষ।

আমরা এতক্ষণ একমনে শুনছিলুম। রামশরণবাবু চুপ করলে আমরা একজোটে জিজ্ঞেস করলুম—আপনি আর কখনো সে মেয়েটিকে দেখতে যান নি?...

রামশরণবাবু বললেন—আর কিছুদিন আলমপুরে থাকলে হয়তো যেতুম। কিন্তু এর অল্পদিনের মধ্যে বদলির হুকুম পেয়ে আলমপুর ছাড়তে হ'ল। তারপরে সে মেয়েটির আর কোন খবর জানি না। মেয়েটি কেন মায়ের সঙ্গে যেতে চাইলে না, আমি আজও বুঝতে পারিনে।

# খুড়ীমা

খুব বর্ষা নামিয়াছে।

দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি।

আমি চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় বসিয়া অঙ্ক কষিতেছি। বেলা প্রায় দুপুর হইতে চলিল। বর্ষা-বাদল না হইলে বিনোদ-মাস্টারের কাছে ছুটি পাওয়া যাইত। কিন্তু কি বাদলাই নামিয়াছে আজ তিন দিন হইতে আমার ভাগ্যে।

এমন সময়ে কোথা হইতে একটা ময়লা-কাপড়-পরা লোক আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠানে দাঁড়াইল এবং আমার দিকে চাহিয়া ফিক করিয়া হাসিল। আজও মনে আছে লোকটার গায়ে একটা ময়লা চিটচিট কামিজ, খালি পা, রুক্ষচুল। বয়েস বুঝিবার উপায় নাই, অন্ততঃ আমার পক্ষে।

আমি লোকটাকে আর কখনও দেখি নাই, কারণ বাবা-মা এখানে থাকিলেও, দিদিমা আমায় ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না বলিয়া এতদিন ছিলাম মামার বাড়িতেই। এ-গ্রামে আমি আসিয়াছি বেশি দিন নয়। যখন চলিয়া গিয়াছিলাম তখন আমার বয়স মাত্র ছ-বছর।

বিনোদ-মাস্টার বলিল—কি পরেশ, কি খবর?

লোকটা উঠানে দাঁড়াইয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে দেখিয়া বলিতে গেলাম—আসুন না ওপরে—

কিন্তু বিনোদ-মাস্টার আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল—কি চাই পরেশ? লোকটা আর একবার কেমন এক ধরনের

হাসিল। এই প্রশ্নের উত্তরে যে-ধরনের হাসা উচিত ছিল তেমন নয়—যেন নিজের প্রশংসা শুনিয়া বিনীত ও লাজুক হাসি হাসিতেছে। ছেলেমানুষ হইলেও বুঝিলাম হাসিটা অসংলগ্ন ধরনের।

বলিল—খিদে পেয়েছে।

আমার জাঠতুতো ভাই শীতল বাড়ির ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া উঠানের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এই যে পরেশ-কাকা কোথা থেকে? কোথায় ছিলেন এতদিন?

লোকটি উত্তরে শুধু বলিল—খিদে পেয়েছে।

শীতল বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া এক বাটি মুড়ি আনিয়া লোকটার কোঁচার কাপড়ে ঢালিয়া দিল। আমি অবাক্ হইয়া ভাবিতেছি লোকটা কে, এবং এত সম্মানসূচক সম্বোধন করিতেছে শীতল-দা অথচ বসিতে বলিতেছে না-ই বা কেন, এমন সময় লোকটা একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। শীতলদা'র দেওয়া মুড়ির এক গাল মাত্র খাইয়া বাকিগুলি একবার রাইট্-য়্যাবাউট্-টার্ণ করিয়া ঘুরপাক খাইয়া উঠানময় কাদার উপর ছড়াইয়া ফেলিল —সঙ্গে সঙ্গে কি একটা দুর্বোধ্য ছড়া উচ্চারণ করিল গান করার সুরে—

গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
খোদার চাল গামছায় বাঁধি
গুগ্‌লি ঝিনুক ঝা—
গুগ্‌লি ঝিনুক—

তখনও সে ঘুরপাক খাইতেছে ও ছড়া বলিতেছে, এমন সময় আমার জ্যাঠামহাশয় দুর্লভ রায়—তিনি অত্যন্ত রাশভারী ও

কড়া মেজাজের লোক—বাড়ির ভিতর হইতে চণ্ডীমণ্ডপের পাশে উঠান হইতে অন্দরে যাইবার দরজাতে দাঁড়াইয়া হাঁক দিয়া বলিলেন—কে চেঁচামেচি করে দুপুরবেলা? ও পাগ্‌লটা? মুড়িগুলো নিলে, তবে কেন ও-রকম ক'রে ফেললে যে বড়—বদমায়েসী করবার আর জায়গা পাও নি?

বলিয়া তিনি আসিয়া লোকটার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া কয়েক ঘা চড় মারিলেন, পরে তাহাকে সজোরে একটা ধাক্কা দিয়া বলিলেন, 'বেরোও এখান থেকে, আর কোনদিন দরজায় ঢুকেছ ত মেরে হাড় গুঁড়ো করব'—আমার বলিষ্ঠ জ্যাঠামহাশয়ের ধাক্কার বেগে রোগা ও পাতলা লোকটা খানিক দূরে ছিটকাইয়া গিয়া কাদায়-পিছল উঠানের উপর পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেল এবং একটু সামলাইয়া লইয়া দাঁড়াইয়া মাটিতে একবার থুথু ফেলিল—রক্তে রাঙা।

ইতিমধ্যে মজা দেখিতে আমাদের বাড়ির ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা উঠানের দরজায় জড় হইয়াছিল—লোকটা ধাক্কা খাইয়া ছিটকাইয়া পড়িতেই তাহারা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

লোকটার উপর সহানুভূতিতে আমার মনটা গলিয়া গেল।

পরেশ-কাকার সহিত এই ভাবেই আমার প্রথম পরিচয়।

ক্রমে জানিলাম পরেশ-কাকা এই গাঁয়েরই মুখুজ্যেবাড়ির ছেলে, পশ্চিমে কোথায় যেন চাকুরি করিত, বয়স বেশি নয়—এই মাত্র পঁচিশ। হঠাৎ আজ বছর-দুই মাথা খারাপ হওয়ার দরুন চাকুরি ছাড়িয়া আসিয়া পথে-পথে পাগলামি করিয়া ঘুরিতেছে। তাহাকে দেখিবার কেহ নাই, সে যে-বাড়ির ছেলে তাহাদের সকলেই বিদেশে কাজকর্ম করে, এখানে কেহ থাকে না, উন্মাদ ভাইকে বাসায় লইয়া যাইবার গরজও কেহ এ-পর্যন্ত দেখায়

নাই। পাগল পরের বাড়ি ভাত চাহিয়া খায়, সব দিন লোক দেয় না, মাঝে মাঝে মার-ধোরও খায়।

একদিন নদীর ধারে পাখির ছানা খুঁজিতে গিয়াছি একাই। আমায় একজন সন্ধান দিয়াছিল গাং-শালিকের অনেক বাসা গাঙের উঁচু পাড়ে দেখা যায়। অনেক খুঁজিয়াও পাইলাম না।

সন্ধ্যা হয়-হয়। রোদ আর গাছের উপরও দেখা যায় না। নদীর পাড়ে ঘন-ছায়া নামিয়াছে। বাড়ি ফিরিতে যাইব, দেখি নদীর ধারে চটকাতলার শ্মশানে গ্রামের প্রহ্লাদ কলুর বৌ যে ছোট টিনের চালাখানা তৈরি করিয়া দিয়াছে, তাহারই মধ্যে কে বসিয়া আছে।

ভয় হইল। ভূত নয় ত?

একটু আগাইয়া গিয়া ভালো করিয়া দেখি ভূত নয়, পরেশ-কাকা। ঘরের মেজেতে শ্মশানের পরিত্যক্ত একখানা জীর্ণ মাদুর পাতিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

আমাকে দেখিয়া বলিল—পয়সা আছে কাছে?

পরেশ-কাকাকে ভয় করিয়া সবাই এড়াইয়া চলে, কিন্তু আমি সাহস করিয়া কাছে গেলাম। আমি জানি পরেশ-কাকা এ-পর্যন্ত মার খাইয়াছে, মারে নাই কাহাকেও। আহা, পরেশ-কাকার পিঠে একটা দগ্‌দগে ঘা, ঘায়ে মাছি বসিতেছে, পাশে একটা মালসায় কতকগুলি ডালভাত, তাহাতেও মাছি বসিতেছে।

বলিলাম—এ জঙ্গলের মধ্যে আছেন কেন কাকা? আসবেন আমাদের বাড়ি? আসুন, শ্মশানে থাকে না—

পরেশ-কাকা বলিল—দূর, শ্মশান বুঝি, এ ত আমার বৈঠকখানা। ওদিকে বাড়ি রয়েছে, দোমহলা বাড়ি। দু-হাজার

টাকা জমা রেখেছি দাদার কাছে। বৌদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে কিনা তাই দিচ্ছে না। ঝগড়া মিটে গেলেই দিয়ে দেবে। পাঁচ বছর চাকরি করে টাকা জমাই নি ভেবেছিস?

কত করিয়া খোসামোদ করিলাম, পরেশ-কাকা মড়ার মাদুর ছাড়িয়া কিছুতে উঠিল না।

ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম পরেশ-কাকার মামারা আসিয়া তাহাকে হুগলি লইয়া গিয়াছে।

দুই বৎসর পরে আমার উপনয়নের দিন ভোজে পরেশ-কাকাকে ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে পরিবেশন করিতে দেখিলাম। শুনিলাম তাহার রোগ সম্পূর্ণ সারিয়া গিয়াছে, মামারা অনেক ডাক্তার কবিরাজ দেখাইয়াছিল, এবং অনেক পয়সাকড়ি খরচ করিয়াছিল।

কি সুন্দর চেহারা হইয়াছে পরেশ-কাকার। পরেশ-কাকা যে এত সুপুরুষ, পাগল অবস্থায় ছেঁড়া নেকড়া পরনে, গায়ে কাদা-ধূলা মাখিয়া বেড়াইত বলিয়াই আমি বুঝিতে পারি নাই। বলিষ্ঠ একহারা গড়ন, রং টকটকে গৌরবর্ণ, মুখশ্রী সুন্দর; দেখিয়া খুশি হইলাম।

কিছুদিন পরে ঘটা করিয়া পরেশ-কাকার বিবাহ হইল। শুনিলাম নববধূ কলিকাতার কোন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ির মেয়ে। বৈকালে খুব ঝড়-বৃষ্টি হওয়ার দরুন বর-বধূর পৌঁছিতে এক প্রহর রাত্রি হইয়া গেল। আলো জ্বালিয়া বরণ হইল। এসিটিলিন গ্যাসের আলোতে আমরা নববধূর মুখ দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম—এ-সব অঞ্চলে অমন সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখি নাই। সকলেই একবাক্যে বলিল বৌ না পরী, পরেশের বহু জন্মের ভাগ্যে এমন বৌ মিলিয়াছে।

বিবাহের কিছুদিন পরে পরেশ-কাকার বৌ বাড়ি চলিয়া গেলেন। মাস-দুই পরে আবার আসিলেন।

সকালে পরেশ-কাকাদের বাড়ি বেড়াইতে গেলাম। তাহাদের বাড়ির সকলে তখন কি-একটা ছুটিতে বাড়ি আসিয়াছে। অনেকে আমার বয়সী ছেলেমেয়ে।

নতুন খুড়ীমা বারান্দায় বসিয়া কুটনো কুটিতেছেন। জরিপাড় শাড়ি পরনে, আমাদের স্কুলে সরস্বতী-প্রতিমা গড়ানো হইয়াছিল এবার, ঠিক যেন প্রতিমার মতো মুখশ্রী।

আমরা সামনের উঠানে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিলাম। পরেশ-কাকার বৌ ওখানে বসিয়া থাকাতে সেদিন আমার যেন উৎসাহ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। ইচ্ছা হইল, কত কি অসম্ভব কাজ করিয়া খুড়ীমাকে খুশি করি। সে কি লাফঝাঁপ, কি দৌড়াদৌড়ি, কি চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিলাম হঠাৎ! গায়ে যেন দশ জনের বল আসিল।

এমন সময় শুনিলাম পরেশ-কাকার বৌ বাড়ির ছেলে নেপালকে বলিতেছেন—ওই ফর্সা ছেলেটি কে নেপাল? বেশ চোখ-দুটি—

নেপাল বলিল—ওপাড়ার গাঙ্গুলী-বাড়ির পাবু—

পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—ডাক না ওকে?

আনন্দে আমার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল। মুখ আগেই রোদে ছুটাছুটিতে রাঙা হইয়াছিল, এখন তা আরও রাঙা হইয়া উঠিল লজ্জায়। অথচ কিসের যে লজ্জা!

গিয়া প্রথমেই একটি প্রণাম করিলাম। পরেশ-কাকার বৌ বলিলেন—তোমার নাম কি? পাবু? ভালো নাম কি?

লজ্জা ও সঙ্কোচের হাসি হাসিয়া বলিলাম—বাণীব্রত—

তিনি বলিলেন—বাঃ, বেশ সুন্দর নাম। যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনিই নাম। পড় ত? বেশ, বেশ। এখানে এস খেলা করতে রোজ। আসবে?

সেরাত্রে আনন্দে আমার বোধ হয় ভালো করিয়া ঘুম হয় নাই। যেন কোন্ স্বর্গের দেবী কি রূপকথার রাজকুমারী যাচিয়া আমার সঙ্গে ভাব করিয়াছেন। অমন রূপ কি মানুষের হয়?

ইহার পরদিন হইতে পরেশ-কাকাদের বাড়ি রোজ যাইতে আরম্ভ করিলাম, দিন নাই, দুপুর নাই, সকাল নাই। কি ভাবই হইয়া গেল খুড়ীমার সঙ্গে! আমার বয়স তখন বারো, খুড়ীমার কত বয়স বুঝিতাম না, এখন মনে হয় তাঁর বয়স ছিল আঠার-উনিশ।

বিবাহের পর-বৎসর গ্রামে খবর আসিল পরেশ-কাকা বিদেশে চাকুরিস্থলে আবার পাগল হইয়া গিয়াছেন। খুড়ীমা তখন মাস-দুই হইল বাপের বাড়ি। পাগল হইবার সংবাদ শুনিয়া বাপের সঙ্গে তিনি স্বামীর কর্মস্থানে গিয়াছিলেন, কিন্তু গিয়া দেখেন পরেশ-কাকাকে পাগলাগারদে পাঠান হইয়াছে। খুড়ীমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় নাই, খুড়ীমার বাবা মেয়েকে পাগলাগারদে লইয়া গিয়া জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিবার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। সব ব্যাপার মিটিয়া গেলে তিনি মেয়েকে লইয়া ফিরিলেন।

পরেশ-কাকার বড় ভ্রাতৃবধূ তখন ছেলেমেয়ে লইয়া গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন, তিনি পত্র লিখিয়া পরেশ-কাকার বৌকে মাস-দুই পরে আনাইলেন। খুড়ীমার আসিবার সংবাদ পাইয়া সকালে উঠিয়াই ছুটিয়া দেখা করিতে গেলাম। তাঁর মুখে ও

চেহারায় দুঃখের কোন চিহ্ন দেখিলাম না, তেমনই হাসি-হাসি মুখ, মুখশ্রী তেমনি সুকুমার, বিদ্যুতের মতো রং এতটুকু ম্লান হয় নাই। কি স্নেহ ও আদরের দৃষ্টি তাঁর চোখে, আমি পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিতেই তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়া হাসিমুখে বলিলেন—এই যে পাবু, কেমন আছ? একটু রোগা দেখছি যে!

আমি উত্তরে হাসিয়া খুড়ীমার সামনে মেজের উপরে বসিয়া পড়িলাম। বলিলাম—আপনি ভালো ছিলেন খুড়ীমা?

খুড়ীমা বলিলেন—আমার আর ভালো থাকাথাকি, তুমিও যেমন পাবু!

পরেশ-কাকা পাগল হইয়াছেন সে-কথা ভাবিয়া খুড়ীমার জন্য দুঃখ হইল। অভাগিনী খুড়ীমা!

খুড়ীমা বলিলেন—কাছে সরে এসে ব'সো পাবু। পাবু আমাকে বড় ভালোবাস—না? ঘাড় নাড়িয়া স্বীকার করিলাম খুব ভালোবাসি।

—আমিও কলকাতায় থাকতে পাবুর কথা বড় ভাবি! পাবু, এ গাঁয়ে তোর মতো ভালোবাসে না কেউ আমায়।

লজ্জায় রাঙা হইয়া হাসিমুখে চুপ করিয়া থাকিতাম। তেরো বছরের ছেলে কি কথাই বা জানি!

—কলকাতা দেখেছ পাবু?

—না, কে ।নয়ে যাবে?

—আচ্ছা, এবার আমি যখন যাব এখান থেকে, নিয়ে যাব সঙ্গে ক'রে। বেশ আমাদের বাড়ি গিয়ে থাকবে, কেমন ত?

—কবে যাবেন খুড়ীমা? শ্রাবণ মাসে? না, এখন কিছুদিন থাকুন এখানে। যাবেন না এখন।

—কেন বল ত?

হাসিয়া তাঁহার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিতাম—আপনি থাকলে বেশ লাগে।

নতুন বামুন হইয়াছি। তখনও একাদশী ছাড়ি নাই, যদিও এক বৎসরের বেশি উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক একাদশীতে খুড়ীমা নিমন্ত্রণ করিয়া আমায় খাওয়াইতেন। নিজের হাতে আমার জন্য খাবার করিয়া রাখেন, কোনদিন মোহনভোগ, কোনদিন নিমকি কি কচুরি, বৈকালে বেড়াইতে গেলে কাছে বসিয়া যত্ন করিয়া খাইতে দেন। অনেক রকম ব্রত করিতেন, তাঁর ব্রতের বামুন আমিই। পৈতে ও পয়সা কত জমা হইয়া গেল আমার টিনের ছোট বাক্সটাতে।

আমিও অবসর পাইলেই খুড়ীমার কাছে ছুটিয়া যাইতাম, ছাদের কোণে বসিয়া কত আবোল-তাবোল বকিতাম তাঁর সঙ্গে। বই পড়িয়া শোনাইতাম। খুড়ীমা বেশ ভালই লেখাপড়া জানিতেন, কিন্তু বলিতেন—পাবু, তুই প'ড়ে শোনা দিকি? ভারি ভালো লাগে আমার তোর মুখে বই-পড়া শুনতে! তোর গলার সুর ভারি মিষ্টি—

আমাদের গ্রামে সে-বার 'নিমাই-সন্ন্যাস' পালা হইয়াছিল বারোয়ারিতে। পালাটার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার একটা গান চমৎকার লাগিয়াছিল বলিয়া শিখিয়া লইয়াছিলাম, এবং বেশ ভালো গাহিতে পারিতাম।

নয়নে কথনো হেরিব না নাথ,<br>
দেখা হবে মনে মনে।<br>
আমার নিশীথ স্বপনে এসো<br>
এস তন্দ্রা-আবরণে।

খুড়ীমা প্রায়ই বলিতেন—পাবু, সেই গানটা গাও ত?

গ্রামের লোকে অনেকে কিন্তু খুড়ীমাকে দেখিতে পারিত না।

আমার কানেও এ-রকম কথা গিয়াছে।

একবার রায়-বাড়ির বড়গিন্নীকে বলিতে শুনিলাম—কি জানি বাপু জানি নে, ও সব কলকেতার কাণ্ড। সোয়ামী যার পাগলাগারদে, তার অত চুলবাঁধার ঘটাই বা কিসের, অত পাতাকাটার বাহারই বা কিসের, এত হাসিখুশিই বা আসে কোথা থেকে! কিবে ঢং, কিবে শাড়ির রং—না বাপু, আমার ত ভালো লাগে না—তবে আমরা সেকেলে বুড়োহাবড়া, কলকেতার ফেশিয়ান্ ত জানি নি?

এ-রকম কথা আমি আরও শুনিয়াছি অন্য-অন্য লোকের মুখে।

মনে হইত তাদের নাকে ঘুষি লাগাইয়া দিই, তাদের সঙ্গে ঝগড়া করি, তাদের বলি—না, তোমরা জান না। তোমাদের মিথ্যা কথা। তোমাদের অনেকের চেয়ে খুড়ীমা ভালো—খুব ভালো।

কিন্তু যাহারা বলে তাহারা গ্রামসম্পর্কে গুরুজন, বয়স অনেক বেশি। কাজেই চুপ করিয়া থাকিতাম।

তাঁহার চেহারা, মুখশ্রী এতকাল পরে আমার খুব যে স্পষ্ট মনে আছে তা নয়। কেবল একদিনের তাঁর অপূর্ব কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমুখ গভীর ভাবে আমার মনে ছাপ দিয়াছিল। যখন সে-মুখ মনে পড়ে তখন একটি উনিশ-কুড়ি বছরের কৌতুকপ্রিয়া, হাস্যমুখী সুন্দরী তরুণীকে চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

সে-বার আমাদের গ্রামে কোথা হইতে এক দল পঙ্গপাল আসিয়াছিল। গাছপালা, বাঁশবন, সজনেগাছ, ঝোপঝাপ পঙ্গপালে ছাইয়া ফেলিল। খুড়ীমা ও আমি ছাদে দাঁড়াইয়া এ-দৃশ্য দেখিতেছিলাম—ত্থ'জনের কেহই আর যে কখনও পঙ্গপাল দেখি নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। হঠাৎ খুড়ীমা বিস্ময়ে ও কৌতুকে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া বলিলেন—ও পাবু, ছাখ্ ছাখ্—রায়েদের নিমগাছে একটা পাতাও রাখে নি, শুধু গুঁড়ি আর ডাল, এমন কাণ্ড ত কখনও দেখি নি—ও মাগো!

বলিয়াই কৌতুকে ও আনন্দে বালিকার মতো খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁর এই হাসিমুখটিই আমার মনে আছে।

বর্ষা কাটিয়া শরৎ পড়িল। আমাদের নদীর ত্থ-ধারে কাশফুল ফুটিয়া আলো করিল। আকাশ নীল, লঘু শুভ্র মেঘখণ্ড বাদামবনীর চরের দিক হইতে উড়িয়া আসে, আমাদের সায়েরের ঘাটের উপর দিয়া, গিরীশ-জ্যাঠাদের বড় আম-বাগানের উপর দিয়া শুভরত্নপুরের মাঠের দিকে কোথায় উড়িয়া যায়…বড় বড় মহাজনী কিস্তী নদী বাহিয়া যাতায়াত শুরু করিয়াছে, কয়ালরা ধান মাপিতে দিনরাত বড় ব্যস্ত।

খুড়ীমা আমাদের গ্রামেই রহিয়া গেলেন। পরেশ-কাকাও পাগলাগারদ হইতে বাহির হইলেন না। খুড়ীমাদের বাড়ি তাঁর ননদের এক দেওর আসিল পূজার সময়, নাম শান্তিরাম. বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, দেখিতে চেহারাটা ভালোই। অল্প দিনের জন্য এখানে বেড়াইতে আসিয়া কেন যে কুটুম্ববাড়ি ছাড়িয়া আর নড়িতে চায় না, যাইলেও অল্প দিনের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া

আবার কিছু কাল কাটাইয়া যায়—ইহার কারণ আমি কিছু বলিতে পারিব না—কেবল ইহা শুনিলাম যে গ্রামে তার নামের সঙ্গে খুড়ীমার নাম জড়াইয়া একটা কুকথা লোকে রটনা করিতেছে। একদিন দুপুরের পরে খুড়ীমাদের বাড়ি গিয়াছি। পিছনের রোয়াকে পেঁপেতলার জানালার ধারে খুড়ীমা বসিয়া আছেন, শান্তিরাম বাহিরের রোয়াকে দাঁড়াইয়া জানালার গরাদে ধরিয়া খুড়ীমার সঙ্গে আস্তে আস্তে এক-মনে কি কথা বলিতেছে—আমাকে দেখিয়া বিরক্তির সুরে বলিল—কি পাবু, দুপুরবেলা বেড়ানো কি? পড়াশুনো করো না? যাও এখন যাও—

আমি শান্তিরামের কাছে যাই নাই, গিয়াছি খুড়ীমার কাছে। কিন্তু আমার দুঃখ হইল যে, খুড়ীমা ইহার প্রতিবাদে একটি কথাও বলিলেন না—আমি তখনই ওদের বাড়ি হইতে চলিয়া আসিলাম। ভয়ানক অভিমান হইল খুড়ীমার উপর—তাঁর কি একটা কথাও বলা উচিত ছিল না?

ইহার পর খুড়ীমাদের বাড়ি যাওয়া একেবারে বন্ধ না করিলেও কমাইয়া দিলাম। খুড়ীমাকে আর তেমন করিয়া পাই না; শান্তিরাম আজকাল দেখি সময় নাই, অসময় নাই, ছাদে কি সিঁড়ির ঘরে বসিয়া খুড়ীমার সহিত গল্প করিতেছে—আমার যাওয়াটা সে যেন তেমন পছন্দ করে না। খুড়ীমাও যেন শান্তিরামের কথার উপর কোন কথা জোর করিয়া বলিতে পারেন না।

খুড়ীমার নামে পাড়ায় পাড়ায় যে-কথা রটনা হইতেছে, তাহা আমার কানে প্রতিদিনই যায়। লক্ষ্য করিলাম, খুড়ীমার উপর আমার ইহার জন্য কোনই রাগ নাই, যত রাগ শান্তিরামের

উপর। সে দেখিতে ফর্সা বটে, বেশ শহুরে-ধরনের গোছালো কথাবার্তাও কয় বটে, শৌখীন সাজপোশাকও করে বটে, কিন্তু হয়ত তাহার ফিট্‌ফাটের সাজগোজের দরুনই হোক, কিংবা তাহার শহর-অঞ্চলের বুলির জন্যেই হোক, কিংবা তাহার ঘন ঘন বার্ডসাই খাওয়ার দরুনই হোক, লোকটাকে প্রথম দিন হইতেই আমি কেমন পছন্দ করি নাই। কেমন যেন মনে হইয়াছিল এ লোক ভালো না।

একদিন চৌধুরীদের পুকুরঘাটে বাঁধানো-রাণায় সর্ব চৌধুরী ও কালীময় বাঁড়ুয্যে কি কথা বলিতেছিল—আমি পুঁটিমাছ-মারা ছিপ-হাতে মাছ ধরিতে গিয়াছি—আমাকে দেখিয়া উহারা কথা বন্ধ করিল। আমি বাঁধানো ঘাটে নামিয়া মাছ ধরিতে বসিলাম। সর্ব চৌধুরী বলিল—তাই ত ছোঁড়াটা যে আবার এখানে।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—বল, বল, ও ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না।

সর্ব চৌধুরী বলিল—এখন কি করবে, এর একটা বিহিত করতে হয়। গাঁয়ের মধ্যে আমরা এমন হ'তে দিতে পারি নে। একটা মিটিং ডাকো। পরেশের বৌ সম্বন্ধে এমন হ'য়ে উঠেছে যে কান পাতা যায় না। নরেশকে একখানা চিঠি লিখতে হয় তার চাকুরির স্থানে, আর ওই শান্তিরাম না কি ওর নাম—ওকেও শাসন ক'রে দিতে হয়।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—শাসন-টাসন আর কি—ওকে এ-গ্রাম থেকে চলে যেতে বলো। না যায় আচ্ছা ক'রে উত্তম-মধ্যম দাও। নরেশ কি চাকুরি ছেড়ে আসবে এখন কুটুম্বু শাসন করতে? সে যখন বাড়ি নেই তখন আমরাই অভিভাবক।

সর্ব চৌধুরী বলিলেন—ছুঁড়ীটাও নাকি বড্ড বাড়িয়েছে শুনতে পাই।

কালীময়-জ্যাঠা বলিলেন—তাই ত শুনছি। বয়েসটা খারাপ কিনা? তাতে স্বামী ওই রকম।

কালীময়-জ্যাঠা আমাকে যতই না বোকা ভাবুন আমার কিন্তু বুঝিতে কিছুই বাকি রহিল না। খুড়ীমার উপর অভিমান চলিয়া গেল, ভাবিলাম ইহারা হয়তো খুড়ীমাকে কোন একটা শক্ত কথা শুনাইবে কিংবা অপদস্থ করিবে। কথাটা খুড়ীমাকে জানাইয়া সাবধান করিয়া দিলে হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়াও দেখিলাম খুড়ীমাকে এ-কথা আমি বলিতে পারিব না, কোন মতেই নয়।

শান্তিরামের উপর ভয়ানক রাগ হইল। তুমি কেন বাপু এখানে আসিয়াছ পরের সংসারের শান্তি নষ্ট করিতে? নিজের দেশে কেন চলিয়া যাও না? এতদিন কুটুম্ববাড়ি পড়িয়া থাকিতে লজ্জাও ত হওয়া উচিত ছিল।

ইহার কিছুদিন পরে আমি কাকাব বাসায় থাকিয়া লেখা-পড়া করিব বলিয়া গ্রাম হইতে চলিয়া গেলাম। যাইবার আগে খুড়ীমার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। মাকে ছাড়িয়া যাইতে যত কষ্ট হইতেছিল, খুড়ীমাকে ছাড়িয়া যাইতেও তেমনি।

খুড়ীমা আদর করিয়া বলিলেন—পাবু, লেখাপড়া শিখে কত বিদ্বান হয়ে আসবে, কত বড় চাকুরি করবে! মনে থাকবে ত খুড়ীমার কথা?

লাজুক মুখে বলিলাম—খুব মনে থাকবে। আমি ভুলব না খুড়ীমা।

খুড়ীমা তাড়াতাড়ি কয়েক পা আগাইয়া আসিয়া বলিলেন —সত্যি বলছিস্ ভুলবি নে কখনও পাবু?

জোর গলায় বলিলাম—কক্ষনো না।

বলিয়াই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তিনি সজল চোখে কিন্তু হাসিমুখে আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সত্যিই বলিতেছি চলিয়া আসিয়াছিলাম নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। গ্রাম ছাড়িতে হইল বাবার কড়া হুকুমে। খুড়ীমাকে কোন ভয়ানক বিপদের মুখে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছি, আমার মন যেন বলিতেছিল।

থাকিলেই বা ছেলেমানুষ কি করিতে পারিতাম? মাস ছয়-সাত পরে গরমের ছুটিতে বাড়ি ফিরিয়া শুনিলাম, মাঘ মাসে শান্তিরাম খুড়ীমাকে লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কেহই তাহাদের কোন সন্ধান করে নাই, কোন আবশ্যক বিবেচনা করে নাই।

খুড়ীমার ইতিহাসের এই শেষ। তার পর দু-একবার খুড়ীমার সংবাদ যে নিতান্ত না পাইয়াছি এমন নয়, যেমন, একবার যখন থার্ড ক্লাশে পড়ি তখন শুনিয়াছিলাম আমাদের গ্রামের কাহারা চাকদায় গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া খুড়ীমাকে দেখিয়াছে—ভাল জামা-কাপড় পরনে, গায়ে এক-গা গহনা ইত্যাদি। আরও একবার ফার্ষ্ট ক্লাশে পড়িবার সময় গাঁয়ে গুজব রটিয়াছিল কাঁচরাপাড়ার বাজারে খুড়ীমার সঙ্গে আমাদের অমূল্য জেলের মা না মাসীমার দেখা হইয়াছে, খুড়ীমার সে চেহারা আর নাই, শান্তিরাম নাকি ফেলিয়া পলাইয়াছে, ইত্যাদি।

খুড়ীমার নিরুদ্দেশ হওয়ার ছ-সাত বছর পরের কথা এ-সব। কিন্তু এ-সব কথার কতদূর মূল্য আছে আমি জানি না। আমার—

ত মনে হয় না গাঁ ছাড়িয়া যাওয়ার পরে খুড়ীমাকে কখনও কেহ কোথাও দেখিয়াছে।

যাক, এ অতি সাধারণ কথা। সব জায়গায় সচরাচর ঘটিয়া আসিতেছে, ইহার মধ্যে নূতনত্ব কি আছে, তা নয়। আমার মনের সঙ্গে খুড়ীমার এই ইতিহাসের সম্বন্ধ কিন্তু খুব সাধারণ নয়। আসল কথাটা সেখানেই।

বড় ত হইলাম, কলেজে পড়িলাম, কলিকাতায় আসিলাম। বাল্যের কত বন্ধুত্ব, কত গলাগলি ভাব, নূতন বন্ধুলাভের জোয়ারের মুখে কোথায় মিলাইয়া গেল। খুড়ীমাকে কিন্তু আমি ভুলিলাম না। এ-খবর কি কেউ জানে, কলেজের ছুটিতে দেশে ফিরিবার সময় নৈহাটী কি কাঁচরাপাড়া স্টেশনে গাড়ি আসিলেই কতবার ভাবিয়াছি এই সব জায়গায় কোথাও হয়ত খুড়ীমা আছেন। নামিয়া কখনও অনুসন্ধান করি নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াই ভাবিয়াছি তাঁর কথা। কলিকাতার কোন কুপল্লীর সহিত তাঁহার কোন যোগ আমি মনেও স্থান দিতে পারি নাই কোনদিন। কেন, তাহা জানি না, বোধ হয় বাল্যে কাঁচরাপাড়া বা চাকদহে তাঁহাকে দেখা গিয়াছে বলিয়া যে গুজব রটিয়াছিল, তাহা হইতেই ঐ অঞ্চলের সহিত তাঁহার সম্পর্ক আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু কেন নামিয়া কখনও খুঁজিয়া দেখি নাই, ইহার কারণ আছে। আমার মনে এ-কথা কে যেন বলিত খুড়ীমা বাঁচিয়া নাই। যে-ভুল তিনি না-বুঝিয়া অল্প বয়সে করিয়া ফেলিয়াছেন, সে-ভুলের বোঝা ভগবান তাঁকে চিরকাল বহিতে দিবেন না, সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা তরুণী খুড়ীমার কাঁধ হইতে সে-বোঝা তিনি নামাইয়া লইয়াছেন।

স্কুল-কলেজের যুগও কাটিয়া গেল। বড় হইয়া সংসারী হইলাম। কত নূতন ভালোবাসা, নূতন মুখ, নূতন পরিচয়ের মধ্য দিয়া জীবন চলিল। কত পুরাতন দিনের অতি-মধুর হাসি ক্ষীণ স্মৃতিতে পর্যবসিত হইল, কত নূতন মুখের নূতন হাসিতে দিনরাত্রি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জীবনে এ-রকমই হয়। একদিন যাহাকে না দেখিলে বাঁচিব না মনে হইত, ধীরে ধীরে সে কোথায় তলাইয়া যায়, হঠাৎ একদিন দেখা গেল তাহার নামটাও আজ মনে নাই।

মনের ইতিহাসের এই ওলটপালটের মধ্য দিয়াও খুড়ীমা কিন্তু টিকিয়া আছেন অনেক দিন। বাল্যে তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় তাঁহাকে কখনও ভুলিব না বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলাম, বালক-হৃদয়ের সেই সরল সত্য বাণীর মান ভগবানই রাখিয়াছেন।

কিসে জানিলাম বলি। আমাদের গ্রাম হইতে খুড়ীমা কতকাল চলিয়া গিয়াছেন। পঙ্গপালও আর কখনও তার পরে আমাদের গ্রামে আসে নাই—কিন্তু রায়েদের সেই নিমগাছটি এখনও আছে। বেশি দিনের কথা নয়—বোধ হয় গত মাঘ মাসের কথা হইবে—রায়েদের বাড়ি জমাজমি সম্পর্কে একটা কাজে গিয়া সীতানাথ রায়ের সঙ্গে একখানা দরকারী দলিলের আলোচনা করিতেছি—হঠাৎ নিমগাছটায় নজর পড়াতে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া গেলাম। বহুদিন এদিকে আসি নাই। বাল্যের সেই নিমগাছটা। পরক্ষণে দুইটি অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ছাব্বিশ বৎসর পূর্বের এক হাস্যমুখী বালিকার কৌতুক ও আনন্দে উচ্ছ্বসিত মুখ মনে পড়িল এবং নিজের অলক্ষ্যাতে মনটা এমন একটা অব্যক্ত দুঃখে ও বিষাদে পূর্ণ হইয়া গেল

যে, দলিলের আলোচনার কোন উৎসাহই খুঁজিয়া পাইলাম না, দেখিলাম, খুড়ীমাকে ত এখনও ভুলি নাই!

বয়স হইয়াছে, মনে হইল মোটে আঠার-উনিশ বছর বয়স ছিল খুড়ীমার! কি ছেলেমানুষই ছিলেন!

মানুষের মনে মানুষ এই রকমেই বাঁচিয়া থাকে। গত ছাব্বিশ বছরের বীথিপথ বহিয়া কত নববধূ গ্রামে আসিয়াছেন, গিয়াছেন—কিন্তু দেখিলাম ছাব্বিশ বছর আগেকার আমাদের গ্রামের সেই বিস্মৃতা হতভাগিনী তরুণী বধূটি আজও এই গ্রামে বাঁচিয়া আছেন।

# বায়ুরোগ

হাঁসখালি থেকে গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর পর্যন্ত যে রাস্তা চলে গিয়েছে, ঐ রাস্তা বেয়ে যাচ্ছিলুম আমার এক আত্মীয়ের বাড়ি। বগুলা স্টেশনে নেমে সোজা পাকা রাস্তা। তুপুরের পর একাই হেঁটে চলেছি, পথে বড় একটা লোকজন নেই, বৃষ্টির দিন, আকাশ মেঘান্ধকার, জোলো হাওয়া বইছে, রাস্তার তু'ধারের বড় বড় গাছ থেকে টুপটাপ জল পড়ছে, দিনটা ঠাণ্ডা, রাস্তা হাঁটবার পক্ষে উপযুক্ত দিন বটে।

ডোমচিতি, গোয়ালবাগি ছাড়িয়েছি। রাস্তার তু'ধারে ঘন ঘন বাগান। আরও আট-দশ মাইল রাস্তা যেতে হবে। একটা বাঁধানো সাঁকোর ওপর বিশ্রাম করব বলে বসেছি, এমন সময় আর একজন পথ-চল্‌তি লোক এসে আমার সামনের সাঁকোটাতে বসল। খানিকটা বসে সে আমার দিকে একবার চাইলে, তারপর একটু সঙ্কোচের সুরে বল্‌লে—বাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে? তারপর দেশলাই নিয়ে বললে—আমার সঙ্গে তামাক আছে, হুঁকো কলকেও আছে। একটু তামাক সাজব, খাবেন?

বললুম—না দরকার নেই। আমি—

লোকটা যেন একটু তুঃখিত হ'ল। বললে—না কেন বাবু, খান না? আমি সেজে দিচ্ছি। এমন সুরে বললে যে, আমার জন্যে তামাক না সাজতে পেয়ে তার মনে যেন সুখ নেই। একটু অবাক্ হয়ে চেয়ে দেখলুম ওর দিকে, চিনিনে শুনিনে

কোনো কালে, আমি তামাক খাই না খাই তাতে ওর কি আসে যায়?

অগত্যা বললুম—সাজ—

এইবার তাকে ভালো করে দেখলুম। বয়েস ত্রিশের মধ্যে, মুখশ্রী কাঁচা, লম্বা লম্বা চুল। গায়ে একটা খাকির সার্ট। কিন্তু ওর চোখ ছু'টো এত শান্ত ও এত নিরীহ যে, দেখলেই তার ওপর কোন সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসে না। একটা ভাঙা ছাতি আর একটা বোঁচকা ওর সম্বল, ধরন-ধারণে নিছক খাঁটি ভবঘুরে।

ছু'জনে একদিকেই পথ চলতে আরম্ভ করলুম তারপর থেকে। মামুদপুরের বাজারে এসে সন্ধ্যা হয়ে গেল। একটি মুদীর দোকানে রাত্রের জন্যে আশ্রয় নিলুম ছু'জনেই—কারণ সবাই বললে,—এখন ছুর্ভিক্ষের সময়, সন্ধ্যার পরে এ পথে হাঁটা নিরাপদ নয়। অনেক সময়, সামান্য পয়সার জন্যে মানুষ খুন করেছে।

আমার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিমধ্যে আমার বেশ আলাপ পরিচয় হয়ে গিয়েছে। সে ব্রাহ্মণের ছেলে, নদীয়া জেলাতেই কোন্ গ্রামে বাড়ি, সংসারে কেউ নেই, দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায়। বছরখানেক পথে বিপথে ঘুরবার পরে সম্প্রতি নিজের গ্রামে ফিরে যাচ্ছে।

একটা স্বভাব দেখলুম তার, সাধারণের পক্ষে স্বভাবটা খুব অদ্ভুত বলতে হবে। লোকের এতটুকু উপকার করতে পারলে সে যেন বেঁচে যায়। কাছের লোককে কি করে খুশি করবে, এই হ'ল তার জীবনে মস্ত বড় একটা নেশা!

রাত্রে সে-ই রান্না করলে। আমায় এতটুকু সাহায্য পর্যন্ত করতে দিলে না।

খেতে বসে আমি বুঝলুম লোকটা পাকা রাঁধুনী। পাকা রাঁধুনী বললে সবটা বলা হ'ল না। রান্নার কাজে সে একজন শিল্পী। উঁচুদরের প্রতিভাবান শিল্পী। সত্যিই অবাক্ হয়ে গেলাম তার রান্না খেয়ে।

বললাম—কোথায় শিখলে হে এমন চমৎকার রান্না?

ও বললে—কেউ শেখায় নি, এমনি হয়েচে।

—তুমি কলকাতায় কি অন্য কোথাও মোটা মাইনের চাকুরি পেতে পারো হে, রান্নার কাজে। ধরো কোনো বড়লোকের বাড়িতে। এরকম ক'রে বেড়াও কেন?

সে হেসে বললে—তাও করেচি। কিন্তু আমার একটা বাতিক আছে বাবু। সেজন্যে আর কোথাও চাকরি স্বীকার করতে ইচ্ছে হয় না। সে কথাটা খুলে বলি তবে। সেটাকে একরকম রোগও বলতে পারেন। হয়তো বা বায়ুরোগ।

আমি ম্যাট্রিক পাস করে ভেবেছিলুম আরও পড়বো, কিন্তু অবস্থা খারাপ ছিল ব'লে পড়ার খরচ চালানো গেল না, সুতরাং ছেড়ে দিতে হ'ল।

তারপর চাকরির সন্ধানে বেরুই। সিংভূম জেলার একটা পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় খনিসংক্রান্ত কি জরীপ হচ্চে। ঘুরতে ঘুরতে সেখানে গিয়ে জুটলাম। মস্ত বড় মাঠে অনেকগুলো তাঁবু পড়েচে, অনেক লোক। আমি একজন ওভারসিয়ারের তাঁবুতে রাঁধুনীর কাজ পেয়ে গেলাম। লোকটির বয়েস চল্লিশের ওপর হবে। একাই থাকে, একটা ছোকরা চাকর ছিল, আমি যাবার পরে তাকে জবাব দিয়ে দিলে।

কিছুদিন সেখানে কাজ করবার পর মনিবের প্রতি আমার একটা অদ্ভুত ধরনের ভালোবাসা লক্ষ্য করলুম। কিসে সে

খুশি হবে, কিসে তাকে তৃপ্তি দিতে পারব খাইয়ে, এই হ'ল আমার একমাত্র লক্ষ্য। সে জিনিসটা একটা নেশার মত আমায় পেয়ে বসল। সেই জংলী জায়গায় খাবার জিনিস মেলে না, আমি হেঁটে দূর দূর গ্রাম থেকে মাছ তরকারী বহুকষ্টে সংগ্রহ ক'রে এনে রাঁধতাম। মনিবকে সকল কথা খুলে বলতাম না যে, কোথা থেকে কি জিনিস আনি। রান্না যতদূর সম্ভব ভালো করবার চেষ্টা করতাম, যাতে খেয়ে তৃপ্তি পায়।

লোকটা যে ভালো লোক ছিল, তা নয়। মাইনে বাকি ফেলতে লাগল, বাজারের পয়সা চুরি করি, এমন সন্দেহও মাঝে মাঝে করতো। আমি সে সব গায়ে মাখিনি কোনোদিন। চার মাস এই ভাবে কাটল। এই চার মাসে আমার অন্য কোন ধ্যান-জ্ঞান ছিল না, কেবল মনিবকে ঠিক সময়ে দু'টি খেতে দেব এবং ভালো খেতে দেব।

কিরকম দু'একটা উদাহরণ দিই।

একবার শুনলুম মুংলী বলে একটা পাহাড়ী নদীতে বাঁধ বেঁধে সাঁওতালরা বড় চিংড়ি মাছ ধরবে। মাছ জিনিসটা ওদেশে বড় দুর্লভ বস্তু। টাকা-পয়সা ফেললেই পাবার যো নেই। চিংড়ি মাছ আনবার জন্যে ভয়ানক পাথর-তাতা রৌদ্রের মধ্যে সাত মাইল চলে গেলুম এবং মাছ নিয়ে ফিরে রাত্রে রান্না করে খাওয়ালুম মনিবকে। সে কথা বললুমও না যে কোথা থেকে মাছ এনেছি।

চার মাস পরে রান্নার খ্যাতি ও প্রভুভক্তির কথা জরীপের তাঁবুর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। সে দেশটাতে ভালো বাঙ্গালী রাঁধুনী পাওয়া যায় না, সকলেই আমার মনিবকে বেশ একটু

হিংসের চোখে দেখতে লাগল, ক্রমে আমার কাছে চুপি চুপি লোক হাঁটতে শুরু করলে আমায় ভাঙ্গিয়ে নেবার জন্যে। বেশি মাইনে দিতে চায়, নানারকম সুবিধে করে দিতে চায়। আমি কিছুতেই গেলাম না। জরীপের হেড্ কানুনগো কুড়ি টাকা পর্যন্ত মাইনে দিতে চাইলে, আমি তখন পাই মোটে সাত টাকা। কিন্তু টাকার সুবিধের কথা আমার মনেই উঠল না। আমার মনিবকে ত আমি এই সব কথা কিছু বলতাম না।

মাস পাঁচ-ছয় পরে কি জানি কেমন কুবুদ্ধি হ'ল মনিবের, আমায় অকারণে বকুনি গালাগালি শুরু করলে। আগেও যে একেবারে না বকতো এমন নয়, কিন্তু তাতে মাত্রা থাকতো। পুরোনো হওয়াতে মনিব বোধ হয় ভাবতে লাগল আমার আর যাবার জায়গা নেই—কাজেই কারণে অকারণে গাল-মন্দ ক্রমেই মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে লাগল।

একদিন মনিব আমায় ডেকে বললেন—শোন এদিকে। আলুতে বালি দিয়ে রাখোনি কেন? সব যে কল্ বেরিয়ে নষ্ট হয়ে গিয়েচে—

সন্ধ্যার কিছু আগে। আমি আধ মাইল দূরবর্তী দোকান থেকে সবেমাত্র তেল, মসলা কিনে ফিরে এসেচি। বললাম—বালি তো দেওয়াই ছিল, বর্ষাকালে বালি দিলেও কি কল্ বেরুনো সামলানো যায় বাবু?

মনিব হঠাৎ চটে উঠে বললে—কি পাজি! রাস্কেল্, আমার সঙ্গে মুখোমুখি উত্তর?

ব'লেই আমায় মারলে হু'টো চড়। তারপর গটগট করে বাইরে চলে গেল।

আমার হাত থেকে তেলের বোতল প'ড়ে চুরমার হয়ে গেল। মারের চোটে ও অপমানে কান লাল হয়ে উঠল। সেখানে বসে পড়লুম এবং অনেকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে বসে রইলুম।

কিন্তু শুনলে আপনি আশ্চর্য হবেন এবং আমিও তখন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলুম যে, মনিবের ওপর রাগের পরিবর্তে আমার উল্টে একটা করুণার উদ্রেক হ'ল। ভাবলুম—আহা, লোকটা জানে না যে, ওর নিজের দোষে এবার আমি হাত-ঝাড়া হয়ে যেতে বসেচি! হেড্ কানুনগোর তাঁবুতে খবর পাঠাবার অপেক্ষা মাত্র। কানুনগোর সঙ্গে যে আমার মনিবের সদ্ভাব নেই, তাও সবাই জানে। খেও কাল থেকে হাত পুড়িয়ে রেঁধে—এখানে আর বাঙ্গালী রাঁধুনী মিলছে না।

এই কথা যতই ভাবি, ততই ওর উপর করুণা ও অনুকম্পা গভীর হয়ে উঠে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি! ভগবান আমার বুকে এসে যেন তাঁর আসন পেতেছেন। ওকে আমি ছেড়ে গেলে ওর কত কষ্ট হবে এবং বিশেষ ক'রে লোকটা কি বোকাই বনে যাবে—এই ভেবেই আমার মন গলে গেল। নিজের অপমান ভুলেই গেলাম একেবারে।

রাত আটটা যখন বেজেচে, তখন আমি উঠে গিয়ে রান্না চড়িয়ে দিলুম। তার আগেই ঠিক করে ফেলেচি আমি মনিবকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

ঘোড়ার সইস্‌টা কিন্তু আড়াল থেকে আমার মার খাওয়াটা দেখেছিল। সে গিয়ে সবাইকে গল্প করেচে। ফলে সকাল থেকে এক হেড্ কানুনগোর কাছ থেকেই আমার কাছে পাঁচবার লোক এলো আমায় ভাঙিয়ে নিতে।

তিন-চার দিন ধ'রে তারা সবাই আমাকে বিরক্ত করে মারলে। মনিব কাজে বেরিয়ে গেলেই তারা আসে। হেড্ কানুনগোর লোক এবং আরও অন্য লোক। কতরকম লোভ দেখায়, মনিবের বিরুদ্ধে আমায় রাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করে।

হেড্ কানুনগো বাবুর সঙ্গে একদিন পথে দেখা। তিনি ঘোড়ায় চেপে কাজে বেরিয়েছিলেন। আমায় দেখে বললেন —ওহে শোনো, আমার লোক তোমার কাছে গিয়েছিল?

বললুম—আজ্ঞে হাঁ।

—তা তুমি আসতে রাজী হও না কেন? শুনলাম সেদিন তোমায় মেরেচে। ছিঃ ছিঃ—কি বলে তুমি সেখানকার ভাত এখনও মুখে তুলচো? চলে এস ওবেলা থেকেই আমার ওখানে। কি বল?

আমি বড় বিপদে পড়ে গেলুম। স্বয়ং হেড্ কানুনগো বাবু! তাঁকে 'না' বলি বা কি করে, এ তো আর উড়ে চাকর বা আরদালির দল নয়। হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এল। বললুম—হুজুর, আজই যাব আপনার ওখানে। দেখুন না, মিছা-মিছি সেদিন অমনি মার দিলেন—

—কি, হয়েছিল কি?

—কিছু না, ওঁর সোনার বোতামের সেট টা আমি মেঝেতে কুড়িয়ে পাই। পেয়ে নিজের বাক্সে তুলে রাখি। ভেবেছিলুম এলে দিয়ে দেব। তারপর আর মনে নেই সন্ধ্যেবেলা। উনি এদিকে পরদিন সকালে বোতাম হারিয়েচে বলে খুব তোলপাড় করচেন বাসা। আমি তখন গিয়েচি দোকানে। সে সময় উনি আমার তোরঙ্গটা খুঁজে বোতাম দেখতে পেয়েছেন সেখানে। তাই আমি দোকান থেকে আসতেই বললেন—

রাস্কেল, তুই চুরি ক'রে রেখেছিলি বোতাম তোর বাক্সে। এই বলেই মার। কিন্তু হুজুর বাস্তবিক আমি চুরির মতলবে—

কানুনগোর মুখের ভাব ক্রমশ পরিবর্তন হতে লাগল, ঘুঘু লোক, বেশ বুঝলেন আমি চুরির মতলবেই সোনার বোতাম তোরঙ্গে রেখেছিলুম। এমন লোককে কে বাসায় স্থান দেবে? তিনি 'হুঁ', 'হাঁ', 'তা বটে' বলতে বলতে সরে পড়লেন।

চতুর্দিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল দু'একদিনের মধ্যেই, যে আমি মনিবের সোনার বোতাম লুকিয়ে রেখেছিলুম, তাই ধরা পড়াতে মার খেয়েছি। আর আমায় কেউ ভাঙ্‌চি দিতে আসে না। জেনে শুনে চোরকে কে কাছে রাখতে চায়?

মনিব একদিন আমায় বললে—এ কি শুনচি? তুমি কানুনগো বাবুর কাছে বলেচ সোনার বোতাম লুকিয়ে রেখে-ছিলে বলে তোমায় মেরেছিলুম সেদিন? কেন এ কথা বললে?

বললুম সবকথা খুলে। ওরা ভাঙ্‌চি দিতে আসে, বিরক্ত করে সর্বদা, না ব'লে উপায় কি? ও কথা না বললে কি আমার নিস্তার ছিল?

মনিব বললেন—তুমি অদ্ভুত লোক। এমন লোক আমি কখনো দেখিনি। আমায় ছেড়ে যেতে হবে বলে নিজের নামে নিজেই একটা মিথ্যে অপবাদ রটালে? এ তো নিজের ভাই করে না, ছেলে করে না। তুমি রাঁধুনীর কাজ কোরো না, সাধারণ লোক নও তুমি। তোমাকে রাঁধুনী করে রেখে দিলে আমার অপরাধ হবে।

তিনি যদিও সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতাম চুরির কথা সর্বৈব মিথ্যে, কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করলে না। মনিবকে

কত বোঝালুম, ছেড়ে যেতে চাইলুম না। তিনি হাতজোড় করে মাপ চাইলেন, বললেন—আমায় অপরাধী করো না, তুমি আমার রাঁধুনীর কাজ করবার লোক নও। যা হয়ে গিয়েচে তার চারা নেই—আর আমি সজ্ঞানে জেনে শুনে তোমায় দিয়ে চাকরের কাজ করাতে পারব না।

সেখানে চাকরি তো গেলই, যদিও এদিকে মনিব সবাইকে বলে বেড়ালেন বোতাম চুরির কথা মিথ্যে, কেউ সে কথা বিশ্বাস করলে না। সবাই ভাবলে চুরির জন্যে আমার চাকরি গেল।

আসবার সময় মনিব তাঁর ঘড়ি-চেন এবং পঞ্চাশটি টাকা দিয়েছিলেন। এই দেখুন সেই ঘড়ি-চেন। কিন্তু সেই থেকে মনে কেমন একটা কষ্ট হ'ল, পথে পথে বেড়াই। আর কারো বাড়ি রাঁধুনীর চাকরি নিইনি। নেবও না।

## অরন্ধনের নিমন্ত্রণ

এক একজন লোকের স্বভাব বড় খারাপ, বকুনি ভিন্ন তারা একদণ্ডও থাকতে পারে না, শ্রোতা পেলে বকে যাওয়াতেই তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। হীরেন ছিল এই ধরনের মানুষ। তার বকুনির জ্বালায় সকলে অতিষ্ঠ। আফিসে যারা তার সহকর্মী, শেষ পর্যন্ত তাদের অনেকের স্নায়ুর রোগ দেখা দিলে, অনেকে চাকরি ছাড়বার মতলব ধরলে।

সব বিষয়ের প্রতিভার মতই বকুনির প্রতিভাও পৈতৃক শক্তির আবশ্যক রাখে। হীরেনের বাবার বকুনিই ছিল একটা রোগ। শেষ বয়সে তাঁকে ডাক্তারে বারণ করেছিল, তিনি বেশি কথা যেন না বলেন। তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন —তবে বেঁচে লাভটা কি ডাক্তারবাবু? যদি দু'একটা কথাই কারো সঙ্গে বলতে না পারলুম! কথা বলতে বলতেই হৃৎপিণ্ড দুর্বল হবার ফলে তিনি মারা যান—মার্টার টু দি কজ!

এ হেন বাপের ছেলে হীরেন। বাইশ বছরের যুবক—আপিসে কাজ করে—আবার রামকৃষ্ণ মঠেও যাতায়াত করে। বিবাহ করবার ইচ্ছে নেই। শুনেছিলাম সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। এতদিন হয়েও যেত কিন্তু রামকৃষ্ণ আশ্রমের লোকেরা এ বিষয়ে তাকে বিশেষ উৎসাহ দেন নি; হীরেন সন্ন্যাসী হয়ে দিনরাত মঠে থাকতে শুরু করলে এক মাসের মধ্যেই মঠ জনশূন্য হয়ে পড়বে।

হীরেনের এক বৃদ্ধা পিসিমা থাকতেন দূর পাড়াগাঁয়ে। স্টেশন থেকে দশ-বারো ক্রোশ নেমে যেতে হয় এমন এক

গ্রামে। পিসিমার আর কেউ নেই, হীরেন সেখানে পিসিমাকে একবার দেখতে গেল। বুড়ী অনেকদিন থেকেই দুঃখ করে চিঠিপত্র লিখ্‌ছিল।

সে গ্রামের সবাই এতদিন জানতো যে, তাদের কুমী অর্থাৎ কুমুদিনীর মতো বকুনিতে ওস্তাদ মেয়ে সে অঞ্চলে নেই। কুমীর বাবা গ্রাম্য পুরোহিত ছিলেন—কিন্তু যেখানে যখন পূজো করতে যেতেন, আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম বকুনির জ্বালায় যজমান ভিটে ছেড়ে পালাবার যোগাড় করতো, বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হবার উপক্রম হ'ত।

কুমীর বাপের বকুনি-প্রতিভার একটা বড় দিক্ ছিল এই যে, তাঁর বকুনির জন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন হত না। যত তুচ্ছ বিষয়ই হোক না কেন, তিনি তাই অবলম্বন করে বিশাল বকুনির ইমারত গড়ে তুলতে পারতেন। মনে যথেষ্ট উৎসাহ ও শক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ বলবার ও ছবি গড়বার ক্ষমতা না থাকলে মানুষে এমন বকতে পারে না বা শ্রোতাদের মনোযোগ ধ'রে রাখতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর সময়ে গ্রামের সকলেই দুঃখ করে বলেছিলে—আজ থেকে গাঁ নিঝুম হয়ে গেল!

দু'একজন বলেছিল—এবার আমসত্ত্ব সাবধানে রৌদ্রে দিও, মুখুয্যে মশায় মারা গিয়েচেন, কাক-চিলের উৎপাত বাড়বে। অর্থাৎ তাদের মতে গাঁয়ে এতদিন কাক-চিল বসতে পারত না মুখুয্যে মশায়ের বকুনির চোটে। নিন্দুক লোক কোন্ জায়গায় নেই?

কিন্তু হায়! নিন্দুকের আশা পূর্ণ হয় নি বা মুখুয্যে মশায়ের হিতাকাঙ্ক্ষীদের দুঃখু করবারও কারণ ঘটে নি।

মুখুয্যে মশায় তাঁর প্রতিনিধি রেখে গিয়েছিলেন তাঁর আট বৎসরের মেয়ে কুমীকে। পিতার দুর্লভ বাক-প্রতিভার অধিকারিণী হয়েছিল মেয়ে। এমন কি তার বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই সন্দেহ করলেন যে, মেয়ে তার বাপকে ছাড়িয়ে না যায়।

সেই কুমীর বয়েস এখন তেরো চোদ্দ। সুশ্রী, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁকড়া কোঁকড়া একরাশ চুল মাথায়, বড় বড় চোখ, মিষ্টি গলার সুর, একহারা গড়ন, কথায় কথায় খিল-খিল হাসি, মুখে বকুনির খই ফুটছে দিন-রাত।

শুভক্ষণে দু'জনের দেখা হ'ল।

হীরেন সকালবেলা পিসিমার ঘরের দাওয়ায় বসিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করবার চেষ্টা করচে, এমন সময়ে পিসিমা আপন মনে বললেন—দুধ কি আজ দিয়ে যাবে না? বেলা যে তেতপ্পর হ'ল—ছেলেটা যে না খেয়ে শুকিয়ে বসে আছে, একটু চা করে দেব তার দুধ নেই—আগে জানলে রাত্রের বাসী দুধ রেখে দিতাম যে—

—রাতের বাসী দুধ রোজ রাখো কি না—

বলতে বলতে একটি কিশোরী একঘটি দুধ-হাতে বাড়ির পেয়ারা গাছটার তলায় এসে দাঁড়াল।

পিসিমা বললেন—দুধের ঘটিটা রান্নাঘর থেকে বের ক'রে নিয়ে আয় দিকি, এনে দুধটা ঢেলে দে—

কিশোরী চঞ্চল লঘুপদে রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকল এবং দুধ ঢেলে যথাস্থানে রেখে এসে আমতলায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে বললে —শোনো ও পিসি, কাল কি হয়েছে জানো?—হি—হি—

পিসিমা বললেন—কি?

এই কথার উত্তরে আমতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েটি হাত-পা নেড়ে একটা গল্প জুড়ে দিলে—কাল দুপুরে নাপিত-বাড়িতে ছাগল ঢুকে নাপিত-বৌ কাঁথা পেতেছিল, সে কাঁথা চিবিয়ে খেয়েছে, এইমাত্র ঘটনাংশ গল্পের। কিন্তু কি সে বলবার ভঙ্গি, কি সে কৌতুকপূর্ণ কলহাসির উচ্ছ্বাস, কি সে হাত-পা নাড়ার ভঙ্গি; পিসিমার চায়ের জল গরম হ'ল, চা ভিজোনো হ'ল, হালুয়া তৈরি হ'ল, পেয়ালায় ঢালা হ'ল—তবুও সে গল্পের বিরাম নেই।

পিসিমা বললেন—ও কুমী মা, একটু ক্ষান্ত দাও, সকালবেলা আমার অনেক কাজকর্ম আছে—তোমার গল্প শুনতে গেলে সারা দুপুরটি যাবে—এই চা-টা আর খাবারটুকু তোর এক দাদা—ওই বড়ঘরের দাওয়ায় বসে আছে—দিয়ে আয় দিকি ?...

কুমী বিস্ময়ের সুরে বললে—কে পিসি ?

—তুই চিনিস্ নে, আমার বড় জেঠতুতো ভাইয়ের ছেলে—কাল রাত্তিরে এসেছে—তবে চা তৈরি করবার আর এত তাড়া দিচ্ছি কি জন্যে ? তুই কি কারো কথা শুনতে পাস্, নিজের কথা নিয়েই বে-হাতি—

কুমী সলাজমুখে চা ও খাবার দাওয়ার ধারে রেখে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু হীরেন তাকে অত সহজে যেতে দিতে প্রস্তুত নয়। সে কুমীর নাপিত-বাড়িতে ছাগলের কাঁথা চিবোনোর গল্প শুনেচে এবং মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত হয়েছে এইটুকু মেয়ের ক্ষমতায়।

সে বললে—খুকী তোমার নাম কি ?

—কুমুদিনী—

হীরেন বললে—এই গাঁয়েই বাড়ি তোমার বুঝি? ও-পাড়ায়? তা ছাগলের কথা কি বলছিলে? বেশ বলতে পার—

কুমী লজ্জায় ছুটে পালাল।

কিন্তু কুমুদিনীকে আবার কি কাজে আসতে হ'ল। হীরেনের সঙ্গে একটু একটু করে পরিচয় হয়েও গেল। দু'জন দু'জনের গুণের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ! দু'জনেই ভাবে এমন শ্রোতা কখনো দেখিনি। তিন দিন পরে দেখা গেল পিসিমার দাওয়ার সামনে উঠোনে দাঁড়িয়ে কুমী এবং দাওয়ায় খুঁটি হেলান দিয়ে বসে হীরেন ঘণ্টাখানেক ধরে পরস্পরের কথা শুনচে, হীরেন অনর্গল বকে যাচ্চে, কুমী শুনচে—আর কুমী যখন অনর্গল বকচে তখন হীরেন মন দিয়ে শুনচে।

সেবার পাঁচ ছ'দিন পিসিমার বাড়ি থেকে হীরেন চলে এল।

কুমী যাবার সময়ে দেখা করলে না ব'লে হীরেন খুব দুঃখিত হ'ল, কিন্তু হীরেন চলে যাবার পরে কুমী দু'তিন দিন মন-মরা হয়ে রইল, মুখে হাসি নেই, কথা নেই।

বুড়ী পিসিমার প্রতি হীরেনের টানটা যেন হঠাৎ বড় বেড়ে উঠ্‌ল; যে হীরেন দু'বছর তিন বছরেও অনেক চিঠিপত্র লেখা সত্ত্বেও এদিকে বড় একটা মাড়াতো না, সে ঘন ঘন পিসিমাকে দেখতে আসতে শুরু করলে।

আজ বছর দুই আগের কথা, হীরেনকে পিসিমা বলেছিলেন —হীরু বাবা, যদি এলি তবে আমার একটা উপকার করে যা। আমার তো কেউ দেখবার লোক নেই, তোরা ছাড়া। নরসুপুরের ধরণী কামারের কাছে একগাদা টাকা পাব জমার খাজনার দরুন। একবার গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে টাকাটার একটা ব্যবস্থা করে আয় না বাবা?

হীরেন এসেচে দু'দিন পিসিমার বাড়ি বেড়িয়ে আম খেয়ে স্ফূর্তি করতে। সে জষ্টি মাসের দুপুর রোদে খাজানার তাগাদা করে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতে আসেনি। কাজেই নানা অজুহাত দেখিয়ে সে পরদিন সকালেই সরে পড়েছিল। এখন সেই হীরেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একদিন বললে···পিসিমা, তোমার সেই নরসুপুরের প্রজার বাকি খাজনার কিছু হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, তবে এই সময় না হয় একবার নিজেই যাই। এখন আমার হাতে তেমন কাজকর্ম নেই, তাই ভাবছি তোমার কাজটা করেই দিয়ে যাই।—

ভাইপোর সুমতি হচ্চে দেখে পিসিমা খুব খুশি।

হীরেন সকালে উঠে নরসুপুরে যায়, দুপুরের আগেই ফিরে এসে সেই যে বাড়ি ঢোকে, আর সারাদিন বাড়ি থেকে বার হয় না। কুমীকেও প্রায়ই দেখা যায় পিসিমার উঠোনে, নয় তো আমতলায়, নয়তো দাওয়ার পইঠাতে বসে হীরুদার সঙ্গে গল্প করতে। কাক-চিল পাড়ায় আর বসে না।

জ্যোৎস্না উঠেচে।

কুমী বললে—চললুম হীরুদা।

—এখনই যাবি কেন, বোস্ আর একটু—

উঠানের একটা ধারে একটা নালা। হঠাৎ কুমী বললে—জ্যোৎস্না রাতে এলো চুলে লাফিয়ে নালা পার হ'লে ভূতে পায়—আমায় ভূতে পাবে দেখবে দাদা—হি-হি-হি-হি—; তারপর সে লাফালাফি ক'রে নালাটা বারকতক এপার-ওপার করচে, এমন সময় ওর মা ডাক দিলেন—ও পোড়ামুখী মেয়ে, এই ভরা সন্ধেবেলা তুমি ও করচ কি? তোমায় নিয়ে আমি যে কি করি? ধিঙ্গী মেয়ে, এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান যদি

তোমার থাকে। হীরু ভালো মানুষের মতো মুখখানি ক'রে হারিকেন লণ্ঠনটা মুছে পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মায়ের পিছু পিছু কুমী চলে গেল, একটু অনিচ্ছার সঙ্গেই গেল, মুখে তার অপ্রতিভের হাসি! হীরেন মনমরা ভাবে লণ্ঠনের সামনে কি একখানা বই খুলে পড়তে বসবার চেষ্টা করল।

মাসের পর মাস যায়, বছরও ঘুরে গেল। নতুন বছরের প্রথমে হীরেনের চাকুরিটা গেল, আপিসের অবস্থা ভালো নয় ব'লে। এই এক বছরের মধ্যে হীরেন পিসিমার বাড়ি আরও অন্ততঃ দশবার এল গেল এবং এই এক বছরের মধ্যে হীরেন বুঝেচে কুমীর মতো মেয়ে জগতে আর কোথাও নেই —বিধাতা একজন মাত্র কুমীকে সৃষ্টি করেচেন। কি বুদ্ধি, কি রূপ, কি কথাবার্তা বলবার ক্ষমতা, কি হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, কি লঘুগতি চরণছন্দ।

প্রস্তাবটা কে উঠিয়েছিল জানি নে, বোধ হয় হীরুর পিসিমাই। কিন্তু কুমুদিনীর জ্যাঠামশাই সে প্রস্তাবে রাজী হন নি—কারণ তাঁরা কুলীন, হীরেনরা বংশজ। কুলীন হয়ে বংশজের হাতে মেয়ে দেবেন তিনি, একথা ধারণা করাই তো অন্যায়।

হীরু শুনে চটে গিয়ে পিসিমাকে বললে—কে তোমাকে বলেছিল পিসিমা ডেকে অপমান ঘরে আনতে? আমি তোমার পায়ে ধরে সেধেছিলুম কুমীর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও? সবাই জানে আমি বিয়ে করব না, আমি রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঢুকব। সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েচে, এবার এই ইয়েটা মিটে গেলেই—

কুমীর কানে কথাটা গেল যে হীরু এই সব বলেচে। সে বললে—হীরুদাকে বিয়ে করতে আমি পায়ে ধরে সাধতে গিয়েছিলুম যে! বয়ে গেল—সন্নিসী হবে তো আমার কি?

হীরু তল্পী বেঁধে পরদিনই পিসিমার বাড়ি থেকে নিজের বাড়ি চলে গেল।

হীরুর বাড়ির অবস্থা এমন কিছু ভালো নয়। এবার তার কাকা আর মা একসঙ্গে বলতে শুরু করলেন—সে যেন একটা চাকরির সন্ধান দেখে। বেকার অবস্থায় বাড়ি বসে কতদিন আর এভাবে চলবে?

হীরুর কাকার এক বন্ধু জামালপুরে রেলওয়ে কারখানার বড়বাবু, কাকার পত্র নিয়ে হীরু সেখানে গেল এবং মাস দুই তাঁর বাসায় বসে-বসে খাওয়ার পরে কারখানার আপিসে ত্রিশ টাকা মাইনের একটা চাকুরি পেয়ে গেল।

লাল টালি-ছাওয়া ছোট্ট কোয়ার্টারটি হীরুর। বেশ ঘর-দোর, বড় বড় জানালা। জানালা দিয়ে মারক পাহাড় দেখা যায়; কাজকর্মের অবসরে জানালা দিয়ে চাইলেই চোখে পড়ে টানেল দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেণ যাচ্চে আসচে। শান্টিং এঞ্জিনগুলো ঝক্ ঝক্ শব্দ করে পাহাড়ের নিচে সাইডিং লাইনের মুড়োয় গিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে। কয়লার ধোঁয়ায় দিনরাত আকাশ-বাতাস সমাচ্ছন্ন।

একদিন রবিবারে ছুটির ফাঁকে সে—আর তার কাকার বন্ধু সেই বড়বাবুর ছেলে মণি, মারক পাহাডের ধারে বেড়াতে গেল। মণি ছেলেটি বেশ, পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে বি-এস্-সি দিয়েচে এবার, তার বাবার ইচ্ছে কাশী হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে তাকে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানো। কিন্তু মণির তা ইচ্ছে নয়, সে

কলকাতায় সায়েন্স্ কলেজে অধ্যাপক রমণের কাছে ফিজিক্স্ পড়তে চায়। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে তার মনান্তর চলচে। হীরু জানত এসব কথা।

বৈকাল বেলাটি। জামালপুর টাউনের আওয়াজ ও ধোঁয়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য ওরা দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ওপর দিয়ে অনেকটা চলে গিয়েচে। নীল অতসী ও বনতুলসীর জঙ্গল হয়ে আছে পাহাড়ের মাথায় সেই জায়গাটায়। ঘন ছায়া নেমে আসচে পূবদিকের শৈলসানুতে, একটি বন্যলতায় হলদে ক্যামেলিয়া ফুলের মতো ফুল ফুটেচে, খুব নিচে কুলী-মেয়েরা পাহাড়তলীর লম্বা লম্বা ঘাস কেটে আঁটি বাঁধ্‌চে—পূবদিকে যতদূর দৃষ্টি যায় সমতল মাঠ, ভুট্টার ক্ষেত, খোলার বস্তি, কেবল দক্ষিণে, পূব-পশ্চিমে টানা পাহাড়শ্রেণী ও শালবন থৈ থৈ করচে, আর সকলের ওপরে উপুড় হয়ে পড়েচে—নিকট থেকে দূরে সুদূরে প্রসারিত মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ।

একটা মহুয়াগাছের তলায় বসে মণি বাড়ি থেকে আনা স্যাণ্ড্‌উইচ্, ডিমসিদ্ধ, রুটি এবং জামালপুর বাজার থেকে কেনা জিলাপী একখানা খবরের কাগজের ওপর সাজালে—থার্মো-ফ্ল্যাস্ক খুলে চা বার ক'রে একটা কলাই-করা পেয়ালায় ঢেলে বললে—এসো হীরুদা—

দেখলে, হীরু অন্যমনস্ক ভাবে মহুয়াগাছের গুঁড়িটা ঠেস্ দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে।

—খাবে এসো, কি হ'ল তোমার হীরুদা?

হীরু নিরুৎসাহ ভাবে খেতে লাগল। সারা বৈকালটি যতক্ষণ পাহাড়ের ওপর ছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক, উদাস—কি যেন একটা ভাবচে। মণি ভাবলে, পাহাড়ে বেড়ানোটাই

মাটি হয়ে গেল হীরুদার জন্যে। পাহাড় থেকে নামবার পথে হীরু হঠাৎ বললে—মণি, একটি মেয়েকে বিয়ে করবে ভাই?

মণি হো হো ক'রে হেসে উঠে বললে—কি ব্যাপার বল তো হীরুদা? তোমার আজ হয়েচে কি?

—কিছু হয় নি, বলো না মণি? একটি গরীবের মেয়েকে বিয়ে ক'রে দায় উদ্ধার করো না? তোমার মতো ছেলের—

—কি, তোমার কোনো আপনার লোক? তোমার নিজের বোন নাকি?

—বোন না হ'লেও বোনের মতই। বেশ মেয়েটি দেখতে, সুশ্রী, বুদ্ধিমতী।

—আমার কথায় তো কিছু হবে না, তুমি বাবাকে কি মাকে বলো। একে তো লেখাপড়া নিয়েই বাবাকে চটিয়ে রেখেচি, আবার বিয়ে নিয়ে চটালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। বাবার মেজাজ বোঝ তো?

রাত্রে নিজের ছোট্ট বাসাটিতে হীরু কথাটা আবার ভাবলে। আজ পাহাড়ের ওপর উঠেই তার কেমন সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। কুমীর কথা তাহলে তো সে মোটেই ভোলে নি! নীল আকাশ, নির্জনতা, ফুটন্ত বন্য ক্যামেলিয়া ফুল, বনতুলসীর গন্ধ—সব সুদ্ধ মিলে একটা বেদনার মতো তার মনে এনে দিয়েচে কুমীর হাসিভরা ডাগর চোখ দুটির স্মৃতি, তার হাত নাড়ার ললিত ভঙ্গি, তার অনর্গল বকুনি...সে তো সন্ন্যাসী হ'য়ে যাবে রামকৃষ্ণ আশ্রমে সবাই জানে, মিথ্যেই পিসিমা কুমীর বাবাকে বিয়ের কথা গিয়েছিলেন বলতে। কিন্তু কুমীকে জীবনে সুখী করে দিয়ে যেতে হবে। এ তার একটা কর্তব্য।

সাহসে ভর ক'রে মণির বাপের কাছে সে প্রস্তাবটা

করলে। হীরুকে মণির বাপ-মা স্নেহ করতেন; তাঁরা বললেন —মেয়ে যদি ভালো হয় তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। তাঁরা চাকরি উপলক্ষে পশ্চিমে থাকেন, এ অবস্থায় স্বঘরের মেয়ের সন্ধান পাওয়াও কঠিন বটে। যখন সন্ধান পাওয়া গিয়েচে ভালো মেয়ের—আর মণির বিয়ে যখন দিতেই হবে, তখন মেয়েটিকে দেখে আসতে দোষ কি?

কুমীর জ্যাঠাকে আগেই চিঠি লেখা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা সমস্ত জিনিসটাকে অবিশ্বাস করে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। অত বড় লোকের ছেলেকে জামাই করার মতো দুরাশা তাঁদের নেই। হীরুর যেমন কাণ্ড!

কিন্তু হীরু পূজোর ছুটিতে সত্যিই মণির এক জাঠতুতো দাদাকে মেয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

কুমী এসে হীরুর পায়ের ধুলো নিয়ে নমস্কার করলে।

হীরু বললে—ভালো আছিস্ কুমী?

—এতদিন কোথায় ছিলে হীরুদা?

—চাকরি করচি যে পশ্চিমে জামালপুরে। সাত-আট মাস পরে তো দেশে ফিরচি।

—ও কাকে সঙ্গে করে এনেচ?

হীরু কেশে গলা পরিষ্কার ক'রে বললে—ও আমার এক বন্ধুর দাদা—

—তা এখানে এসেচে কেন?

—এসেচে গিয়ে ইয়ে—এমনি বেড়াতে এসেচেই ধরো—তবে—ইয়ে—

—তোমায় আর ঢোক গিলতে হবে না। আমি সব জানি, কেন ওসব চেষ্টা করচ হীরুদা?

হীরু বললে—যাও—অমন করে না ছিঃ, চুলটুল বেঁধে দিতে বল গিয়ে। ওঁরা খুব ভালো লোক, আর বড় লোক। জামালপুরে ওঁদের খাতির কি! আমি অনেক কষ্টে ওঁদের এখানে এনেচি। বড় ভালো হবে এ বিয়ে যদি ভগবানের ইচ্ছেয় হয়—

অনেক কষ্টে কুমীকে রাজী করিয়ে তার চুল বাঁধা হ'ল, মেয়ে দেখানোও হ'ল। দেখানোর সময় মেয়ের অজস্র গুণ ব্যাখ্যা ক'রে গেল হীরু। কুমী কিন্তু পাঞ্জাব প্রদেশ কোন্ দিকে বলতে পারলে না, তাজমহল কে তৈরি করেছিল সে সম্বন্ধেও দেখা গেল সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হাতের লেখা বেঁকে গেল। গান গাইতে জানে না বললে—যদিও সে ভালোই গাইতে জানে এবং তার গলার সুরও বেশ ভালো।

সঙ্গের ভদ্রলোকটি মেয়ে দেখা শেষ ক'রেই ফিরতি নৌকোতে রেল স্টেশনে চলে গেলেন। রাত্রের ট্রেণেই তিনি খুলনায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাবেন। যাবার সময়ে ব'লে গেলেন—মতামত চিঠিতে জানাবেন। হীরু তাঁকে নৌকোতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে কুমীকে বললে—কি ক'রে বললে—গান গাইতে জানো না? ছিঃ একি ছেলেমানুষি, ওরা শহরের মানুষ, গান শুনলে খুব খুশি হয়ে যেত। এমনি তো ঘরের কোণে খুব গান বেরোয় গলায়? আর এর বেলা—

কুমী রাগ ক'রে বললে—ঘরের কোণে গান গাইবে না তো কি আসরে বসে গাইতে যাবে? পারব না যার তার সামনে গান গাইতে।

হীরুও রেগে বললে—তবে থাকো চিরকাল আইবুড়ো ধিঙ্গী হ'য়ে। আমার কি? কুমীর বাড়ির ও পাড়ার সবাই

এজন্য কুমীকে ভর্ৎসনা করলে। গান গাও না গাও, গান গাইতে জানি একথা বলার দোষ ছিল কি? ছিঃ, কাজটা ভালো হয় নি।

বলাবাহুল্য, ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোন পত্র এল না এবং হীরু পূজার ছুটি অন্তে জামালপুরে গিয়ে শুনলে, মেয়ে তাঁদের পছন্দ হয় নি।

মাস পাঁচ-ছয় কেটে গেল। কি অদ্ভুত পাঁচ-ছ' মাস! কাজ করতে করতে জানালা দিয়ে যখনই উঁকি দিয়ে বাইরের দিকে চায়, তখনই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, কুমীকে কতবার জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেচে···হাত-পা নেড়ে উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হেসে গড়িয়ে পড়ে কুমী গল্প করেচে···নিম-ফুলের গন্ধভরা কত অলস চৈত্র-দুপুরের স্মৃতিতে মধুর হয়ে উঠেচে বর্তমান কর্মব্যস্ত দিনগুলি···

ইতিমধ্যে এক ছোকরা ডাক্তারের সঙ্গে তার খুব আলাপ হ'য়ে গেল। নতুন এম্-বি পাস ক'রে জামালপুরে প্র্যাক্‌টিস্ করতে এসেচে, বেশ সুন্দর চেহারা, বাড়ির অবস্থাও খুব ভালো, তার জ্যাঠামশাই এখানে বড় চাকরি করেন। কথায় কথায় হীরু জানতে পারলে ছোকরা এখনও বিয়ে করে নি এবং কুমীদের পাল্‌টি ঘর। অনেক বুঝিয়ে সে তার জ্যাঠামশাইকে মেয়ে দেখতে যেতে রাজী করালে। মেয়ে দেখাও হ'ল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই হ'ল না, তাঁদের কুটুম্ব পছন্দ হয়নি শোনা গেল। একে তো অজ পাড়াগাঁ, দ্বিতীয়তঃ তাঁরা ভেবেছিলেন পাড়াগাঁয়ের জমিদার কিংবা অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে, অমন গরীব ঘরের মেয়ে তাঁদের চলবে না।

মাস তিনেক পরে হীরু আর এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়ে পিসিমার বাড়ি হাজির হ'ল। কুমীদের বাড়ির সবাই বললে—হীরু বড় ভালো ছেলে, কুমীর জন্য চেষ্টা করচে প্রাণপণে। কিন্তু অত বড় বড় সম্বন্ধ এনে ও ভুল করচে, ওসব কি জোটে আমাদের কপালে? মেয়ে পছন্দ হ'লেই বা অত টাকা দিতে পারবো কোত্থেকে?

কুমীর সঙ্গে খিড়কী দোরের কাছে হীরুর দেখা। কুমী বললে—হীরুদা, তুমি কেন এসব পাগলামি করচ বল ত? বিয়ে আমি করব না, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি, তুমি ওসব বন্ধ কর।

হীরু বললে—ছিঃ লক্ষ্মী দিদি, অমন করে না, এবার যে জায়গায় ঠিক করচি, তাঁরা খুব ভালো লোক, এবার নির্ঘাত লেগে যাবে—

কুমী লজ্জায় রাঙা হয়ে বললে—তুমি কি যে বল হীরুদা! আমার রাত্রে ঘুম হচ্চে না, লাগবে কি না লাগবে তাই ভেবে। মিছিমিছি আমার জন্য তোমাকে লোকে যা তা বলে—তা জানো? তুমি ক্ষান্ত দাও, তোমার পায়ে পড়ি হীরুদা—

হীরু এসব কথা কানে তুললে না। পাত্রপক্ষের লোক নিয়ে এসে হাজির করলে, কিন্তু কুমী কিছুতেই এবার তাদের সামনে আসতে রাজী হ'ল না। সে দস্তুর মতো বেঁকে বসলো।

হীরু বাড়ির মধ্যে গিয়ে বললে—পিসিমা, আপনারা দেরি করচেন কেন?

কুমীর মা বললেন—এসে বোঝাও না মেয়েকে বাবা!

আমরা তো হার মেনে গেলাম। ও চুলে চিরুণী ছোঁয়াতে দেবে না, উঠবেও না, বিছানায় পড়েই রয়েচে।

কুমী ঘর থেকে বললে—পড়ে থাকব না তো কি? বারে বারে সং সাজতে পারবো না আমি, কারো খাতিরেই না। হীরুদাকে বল না—সং সেজে বেরুক্ ওদের সামনে।

হীরু ঘরের মধ্যে ঢুকে কড়া সুরে বললে—কুমী ওঠ্, কথা শোন্—যা চুল বাঁধগে যা—

—আমি যাব না—

—যাবি নে, চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যাব—ওঠ্—দিন দিন ইয়ে হচ্চেন—না? ওঠ্ বলচি—

কুমী দ্বিরুক্তি না ক'রে বিছানা ছেড়ে দালানে চুল বাঁধতে বসে গেল, সাজানো গোজানোও বাদ গেল না, মেয়ে দেখানোও হ'ল, কিন্তু ফল সমানই দাঁড়ালো অর্থাৎ পাত্রপক্ষ বাড়ি গিয়ে চিঠি দেবো ব'লে গেলেন।

জামালপুরের কাজে এসে যোগ দিলে হীরু। কিন্তু সে যেন সর্বদাই অন্যমনস্ক। কুমীর জন্য এত চেষ্টা ক'রেও কিছু দাঁড়ালো না শেষ পর্যন্ত! কি করা যায়? এদিকে কুমীদের বাড়িতেও তার পসার নষ্ট হয়েচে, তার আনা সম্বন্ধের ওপর সবাই আস্থা হারিয়েচে। হারাবারই কথা। এবার সেখানেও কথা তুলবার মুখ নেই তার। অত বড় বড় সম্বন্ধ নিয়ে যাওয়াই বোধ হয় ভুল হয়েচে। কুমীর ভালো ঘর জুটিয়ে দেবার ব্যাকুল আগ্রহে সে ভুলে গিয়েছিল যে, বড়তে ছোটতে কখনো খাপ খায় না।

লজ্জায় সে পিসিমার বাড়ি যাওয়া ছেড়ে দিলে।

বছর দুই তিন কেটে গেল।

হীরু চাকরিতে খুব উন্নতি ক'রে ফেলেচে তার সুন্দর চরিত্রের গুণে। চিফ্ ইঞ্জিনীয়ারের আপিসে বদলি হ'ল দেড়শো টাকায় মার্চ মাস থেকে।

হীরু আর সেই হীরু নেই। এমনি হয়, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বৎসর, তিলে তিলে মানুষের দেহের ও মনের পরিবর্তন হচ্চে—অবশেষে পরিবর্তন এমন গুরুতর হয়ে ওঠে যে, বহুকাল পরে আবার সাক্ষাৎ হ'লে আগের মানুষটিকে আর চেনাই যায় না। হীরু ধীরে ধীরে বদলেচে। অল্প অল্প ক'রে সে কুমীকে ভুলেচে। রামকৃষ্ণ আশ্রমে যাবার বাসনাও তার নেই বর্তমানে। এর মূলে একটা কারণ আছে, সেটা এখানে বলি। জামালপুরে একজন বয়লার-ইন্স্পেক্টার ছিলেন, তাঁর বাড়ি হুগলী জেলায়, রুড়কীর পাস ইঞ্জিনীয়ার, বেশ মোটা মাইনে পেতেন। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে তাঁর দুটি মেয়ের বিয়ে দিতে তাঁকে সর্বস্বান্ত হ'তে হয়েচে। এখনও একটি মেয়ে বাকি।

হীরুর সঙ্গে এই পরিবারের বেশ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। সুরমা হীরুর সামনে বার হয়, তাকে দাদা ব'লে ডাকে, কখনও কখনও নিজের আঁকা ছবি দেখায়, গল্প করে, গান শোনায়।

একদিন হঠাৎ হীরুর মনে হ'ল—সুরমার মুখখানা কি সুন্দর! আর চোখ দুটি—পরেই ভাবল—ছিঃ, এসব কি ভাবচি? ও ভাবতে নেই।

আর একদিন অমনি হঠাৎ মনে হ'লো—কুমীর চেয়ে সুরমা দেখতে ভালো—কি গায়ের রং সুরমার! তখনই নিজের এ চিন্তায় ভীত ও সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ল। না, কি ভাবনা এসব,

মন থেকে এসব জোর ক'রে তাড়াতে হবে। কিন্তু জীবনকে প্রত্যাখ্যান করা অত সহজ হ'লে আজ গেরুয়াধারী স্বামীজীদের ভিড়ে পৃথিবীটা ভর্তি হ'য়ে যেতো। হীরুর বয়েস কম, মন এখনও মরে নি, শুষ্ক, শীর্ণ, এক অতীত মনোভাবের কঙ্কালের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখতে তার নবীন ও সতেজ মন ঘোর আপত্তি জানালে। কুমীর সঙ্গে যা কিছু ছিল, সে অমূল তরু শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে গিয়েচে আলো-বাতাস ও পৃথিবীর স্পর্শ না পেয়ে।

সুরমাকে বিয়ে করার কিছুদিন পরে সুরমার বাবা বয়লার ফাটার দুর্ঘটনায় মারা গেলেন; রেল কোম্পানী হীরুর শাশুড়ীকে বেশ মোটা টাকা দিলে এজন্যে; প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকাও যা পাওয়া গেল তাতে মেয়ের বিয়ের দেনা শোধ করেও হাতে ছ' সাত হাজার টাকা রইল। সুরমার মা ও একটি নাবালক ভাইয়ের দেখাশোনার ভার পড়েছিল হীরুর উপর, কাজেই টাকাটা সব এসে পড়লো হীরুর হাতে। হীরু সে টাকায় কয়লার ব্যবসা আরম্ভ করল। চাকরি প্রথমে ছাড়ে নি, কিন্তু শেষে রেল কারখানায় কয়লার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে একবার বেশ মোটা কিছু লাভ ক'রে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতে ভালো ভাবেই নাম্‌ল। সুরমাকে বিয়ে করার চার বছরের মধ্যে হীরু একজন বড় কণ্ট্রাক্টার হয়ে পড়ল। শাশুড়ীর টাকা বাদ দিয়েও নিজের লাভের অংশ থেকে সে তখন ত্রিশ চল্লিশ হাজার টাকা কারবারে ফেলেচে।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে হীরুর চালচলনও বদলে গিয়েচে। রেলের কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে মুঙ্গেরে গঙ্গার ধারে বড় বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানেই সকলকে রেখেচে। রেলে

জামালপুরে যাতায়াত করে রোজ, মোটর এখনও করেনি—তবে বলতে শুরু করেচে মোটর না রাখলে আর চলে না; ব্যবসা রাখতে গেলে ওটা নিতান্তই দরকার, বাবুগিরির জন্য নয়। হঠাৎ এই সময় দেশ থেকে পিসিমার চিঠি এল, তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না; বহুকাল হীরুকে দেখেন নি তিনি, তাঁর বড় ইচ্ছে মুঙ্গেরে হীরুর কাছে কিছুদিন থাকেন ও দুবেলা গঙ্গাস্নান করেন।

সুরমা বললে—আসতে যখন চাইচেন, নিয়ে এস গে—আমিও তাঁকে কখনও দেখিনি—আমরা ছাড়া আর তাঁর আছেই বা কে? বুড়ো হয়েচেন—যে ক'দিন বাঁচেন এখানেই গঙ্গাতীরে থাকুন।

বাসায় আর এমন কেউ ছিল না, যাকে পাঠানো যায় পিসিমাকে আনতে, কাজেই হীরুই দেশে রওনা হলো।

ভাদ্রমাস। দেশ এবার ভেসে গিয়েচে অতিবৃষ্টিতে। কোদ্‌লা নদীতে নৌকায় ক'রে আসবার সময় দেখলে জল উঠে দুপাশের আউশ ধানের ক্ষেত ডুবিয়ে দিয়েচে। গোয়াল-বাসির বিলে জল এত বেড়েচে যে, নৌকোর বুড়ো মাঝি বললে সে তার জ্ঞানে কখনও এমন দেখেনি, গোয়ালবাসি ও চিত্রাঙ্গপুর গ্রাম দু'খানা প্রায় ডুবে আছে।

অথচ এখন আকাশে মেঘ নেই, শরতের সুনীল আকাশের নিচে রৌদ্রভরা মাঠ, জল বাড়বার দরুণ নৌকো চললো মাঠের মধ্য দিয়ে, বড় বাব্‌লা বনের পাশ কাটিয়ে, ঘন সবুজ দীর্ঘ লতানে বেতঝোপ কড় কড় ক'রে নৌকার ছইয়ের গায়ে লাগচে, মাঠের মাঝে বন্যার জলের মধ্যে জেগে আছে ছোট ছোট ঘাস, তাতে ঘন ঝোপ।

পিসিমাদের গ্রামে নৌকো ভিড়তে দুপুর ঘুরে গেল। এখানে নদীর পাড় খুব উঁচু বলে কূল ছাপিয়ে জল ওঠে নি; দু-পাড়েই বন, একদিকে হ্রস্ব ছায়া পড়েচে জলে, অন্য পাড়ে খররৌদ্র।...এই বনের গন্ধ...নদীজলের ছলছল শব্দ...বাঁশ-বনে সোনার সড়কীর মতো নতুন বাঁশের কোঁড় বাঁশঝাড়ের মাথা ছাড়িয়ে উঠেচে...এই শরত দুপুরের ছায়া...এই সব অতি পরিচিত দৃশ্য একটিমাত্র মুখ মনে করিয়ে দেয়...অনেকদিন আগের মুখ...হয়তো একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে, তবুও সেই মুখ ছাড়া আর কোনো মুখ মনে আসে না। নদীর ঘাটে নেমে, পথে চলতে চলতে সে মুখ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল মনের মধ্যে...এক ধরনের হাত-নাড়ার ভঙ্গি আর কি বকুনি, অজস্র বকুনি!...জগতে আর কেউ তেমন কথা বলতে পারে না। অনেক দূরের কোন্ অবাস্তব শূন্যে ঘুরচে সুরমা, তার আকর্ষণের বাইরে এ রাজ্য। এখানে গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী আর একজন, তার একচ্ছত্র অধিকার এখানে—সুরমা কে? এখানকার বন, নদী, মাঠ, পাখি সুরমাকে চেনে না।

হীরু নিজেই অবাক্ হয়ে গেল নিজের মনের ভাবে।

পিসিমা যথারীতি কান্নাকাটি করলেন অনেকদিন পরে ওকে দেখে। আরও ঢের বেশি বুড়ী হয়ে গিয়েছেন, তবে এখনও অথর্ব হন নি। বেশ চলতে ফিরতে পারেন। হীরুর জন্য ভাত চড়াতে যাচ্ছিলেন, হীরু বললে—তোমায় কষ্ট করতে হবে না পিসিমা, আমি চিঁড়ে খাব। ওবেলা বরং রেঁধো।

অনেকবার বলি বলি করেও কুমীর কথাটা সে কিছুতেই পিসিমাকে জিগ্যেস করতে পারলে না। একটু বিশ্রাম ক'রে বেলা পড়লে সে হাটতলার মধু ডাক্তারের ডাক্তারখানায় গিয়ে

বসল। মধু ডাক্তারের চুল-দাড়িতে পাক ধরেচে, একটি ছেলে সম্প্রতি মারা গিয়েচে—সেই গল্প করতে লাগল। গ্রামের মক্তবের সেই বুড়ো মৌলবী এখনও আছে; এখনও সেই রকম নিজের অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতার প্রসঙ্গে সাব্-ইনস্পেক্টর মহিম-বাবুর গল্প করে। মহিমবাবু ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এ অঞ্চলে স্কুল সাব-ইনস্পেক্টারী করতেন। এখন বোধ হয় মরে ভূত হয়ে গিয়েচেন। কিন্তু কোন্‌বার মক্তব পরিদর্শন করতে এসে নিজেই শুভঙ্করীর সারাকালির একটা অঙ্ক দিয়ে নিজেই কষে বুঝিয়ে দিতে পারেন নি, সে গল্প আজও এদেশে প্রচলিত আছে। এই মৌলবী সাহেবের মুখেই হীরু এ গল্প বহুবার শুনেচে।

সন্ধ্যা হবার পূর্বেই হীরু হাটতলা থেকে উঠল। মধু ডাক্তার বললে—বসো হে হীরু, সন্ধ্যেটা জ্বালি—তারপর দু-একহাত খেলা যাক। এখন না হয় বড়ই হয়েচ, পুরোনো দিনের কথা একেবারে ভুলে গেলে যে হে!

হীরু পথশ্রমের ওজুহাত দেখিয়ে উঠে পড়ল; তার শরীর ভাল নয়, পুরোনো দিনের এই সব আবেষ্টনীর মধ্যে এসে পড়ে সে ভালো করে নি।

কুমী এখানে আছে কিনা, এ কথাটা মধু ডাক্তারকেও সে জিগ্যেস করবে ভেবেছিল। ওদের একই পাড়ায় বাড়ি। কুমী মধু ডাক্তারকে কাকা বলে ডাকে। কুমীদের সম্বন্ধে মাত্র সে এইটুকু শুনেছিল যে, কুমীর জ্যাঠামশাই বছর পাঁচেক হোল মারা গিয়েচেন এবং জাঠতুতো ভাইয়েরা ওদের পৃথক করে দিয়েচে।

অন্যমনস্ক ভাবে চলতে চলতে সে দেখলে কখন কুমীদের

পাড়াতে, একেবারে কুমীদের বাড়ির সামনেই এসে পড়েচে। সেই জিউলি গাছটা, এই গাছটাতে একবার সাপ উঠে পাখীর ছানা খাচ্ছিল, কুমী তাকে ছুটে গিয়ে খবর দিতে, সে এসে সাপ তাড়িয়ে দেবার জন্য ঢিল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। এ পাড়ার গাছে পালায়, ঘাসের পাতায়, সন্ধ্যার ছায়ায়, শাঁখের ডাকে কুমী মাখানো। এই রকম সন্ধ্যায় কুমীদের বাড়ি বসে সে কত গল্প করেচে কুমীর সঙ্গে !

চুপ করে সে জিউলিতলায় খানিকটা দাঁড়িয়ে রইল।...

তার সামনের পথটা দিয়ে তেইশ চব্বিশ বছরের একটি মেয়ে দুটো গরুর দড়ি ধরে নিয়ে আসচে! কুমীদের বাড়ির কাছে বাঁশতলাটায় যখন এল, তখন হীরু চিনতে পারলে সে কুমী।

প্রথমটা সে যেন অবাক্ হয়ে গেল...আড়ষ্টের মতো দাঁড়িয়ে রইল সত্যই কুমী ? এমন অপ্রত্যাশিতভাবে একেবারে তার চোখের সামনে! কুমীই বটে, কিন্তু কত বড় হয়ে গিয়েছে সে!

হঠাৎ হীরু এগিয়ে গিয়ে বললে—কুমী কেমন আছ ? চিনতে পারো ?

কুমী চমকে উঠল, অন্ধকারে বোধ হয় ভাল করে চিনতে পারলে না, বললে—কে ?

—আমি হীরু।

কুমী অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বার হ'ল না। তারপর এসে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে হীরুর মুখের দিকে চেয়ে বললে—কবে এলে হীরুদা ? কোথায় ছিলে এতকাল ? সেই জামালপুরে ?

—আজই দুপুরে এসেচি।

আর কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সে কেবল একদৃষ্টে কুমীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কুমীর কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা, পরণে একখানা আধময়লা শাড়ি—যে কুমীকে সে দেখে গিয়েছিল ছ-সাত বছর আগে, এ সে কুমী নয়। সে কৌতূহলোচ্ছল কলহাস্যময়ী কিশোরীকে এর মধ্যে চেনা যায় না। এ যেন নিরানন্দের প্রতিমা, মুখশ্রী কিন্তু আগের মতোই সুন্দর। এতদিনেও মুখের চেহারা খুব বেশী বদলায় নি।

কুমী বললে—এসো আমাদের বাড়ি হীরুদা। কত কথা যে তোমার সঙ্গে আছে, এই ক'বছরে কত কথা জমানো রয়েচে, তোমায় বলব বলব করে কতদিন রইলাম, তুমি এ পথে আর এলেই না।

হয়েছে! সেই কুমী! ওর মুখে হাসি সেই পুরোনো দিনের মতই আবার ফুটে উঠেছে; হীরু ভাবলে, আহা, ওর বকুনির শ্রোতা এতদিন পায়নি তাই ওর মুখখানা ম্লান।

—তুই আগে চল কুমী।

—তুমি আগে চল্, হীরুদা।

চার-পাঁচ বছরের একটি ছেলে রোয়াকে বসে মুড়ি খাচ্ছিল। কুমীকে দেখে বললে—ওই মা এসেচে!

—বসো হীরুদা, পিঁড়ি পেতে দিই! মা বাড়ি নেই, ওপাড়ায় গিয়েচে রায়-বাড়ি, কাল ওদের লক্ষ্মীপূজোর রান্না রেঁধে দিতে। আমি ছেলেটাকে মুড়ি দিয়ে বসিয়ে রেখে গরু আনতে গিয়েছিলুম দীঘির-পাড় থেকে। উঃ—কতকাল পরে দেখা হীরুদা! বসো, বসো। কি খাবে বলো তো? তুমি মুড়ি আর ছোলাভাজা খেতে ভালোবাসতে। বসো,

সন্দেটা দেখিয়ে খোলা চড়িয়ে গরম গরম ভেজে দিই। ঘরে ছোলাও আছে, নারকোলও আছে। দাঁড়াও, আগে পিদিমটা জ্বালি।

সেই মাটির ঘর সেই রকমই আছে। সেই কুমী সন্ধ্যা-প্রদীপ দিচ্চে পুরোনো দিনের মতো, যখন সে কত রাত পর্যন্ত ওদের বাড়ি বসে গল্প করতো। তবুও কত—কত পরিবর্তন হয়ে গিয়েচে! কত ব্যবধান এখন তার আর কুমীর মধ্যে।

কুমী প্রদীপ দেখিয়ে চাল ভাজতে বসল। একটু পরে ওকে খেতে দিয়ে সামনে বসল সেই পুরোনো দিনের মতোই গল্প করতে। সেই হাত-পা নাড়া, সেই বকুনি—সবই সেই। কত কথা বলে গেল। হীরু ওর দিকে চেয়ে থাকে, চোখ আর অন্য দিকে ফেরাতে পারে না। কুমীও তাই।

হীরু বললে—ইয়ে, কোথায় বিয়ে হ'ল কুমী?

কুমী লজ্জায় চোখ নামিয়ে বললে—সামটা।

—তা বেশ।

তারপর কুমী বললে, ক'দিন থাকবে এখন হীরুদা?

—থাকবার যো নেই, কাজ ফেলে এসেছি, পিসিমাকে নিয়ে কালই যাব। পিসিমা চিঠি লিখেছিলেন বলেই তো তাঁকে নিতে এলাম।

—না, না হীরুদা, সে কি হয়? কাল ভাদ্র মাসের লক্ষ্মীপুজো, কাল কোথায় যাবে? থাকো এখন দু'দিন। কতকাল পরে এলে। তুমিও তো বিয়ে করেচ, বৌদিকে নিয়ে এলে না কেন? দেখতাম। ছেলেমেয়ে কি?

—দুটি ছেলে একটি মেয়ে।

—বেশ, বেশ। আচ্ছা, আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?

মনে খুব পড়তো না, কিন্তু একথাও ঠিক যে, এখন এমন মনে পড়চে যে সুরমা ও জামালপুর অস্পষ্ট হয়ে গিয়েচে। বড় লোকের মেয়ে সুরমা তার মনের মতো সঙ্গিনী নয়, তার সঙ্গে সব দিক্ থেকে মেলে—খাপ খায় এই কুমীর। অথচ সুরমার জন্য দামী মাদ্রাজী শাড়ি কিনে নিয়ে যেতে হবে কলকাতা থেকে যাবার সময়—সুরমা বলেচে, যাচ্চ যখন দেশে, ফিরবার সময় কলকাতা থেকে পূজোর কাপড়-চোপড় কিনে এনো। এখানে ভালো জিনিস পাওয়া যায় না, দরও বেশি।

আর কুমীর পরণে ছেঁড়া আধময়লা কাপড়।

না—দরিদ্র গৃহলক্ষ্মীকে বড়লোকী উপহার দিয়ে সে তার অপমান করবে না।

কুমী বকেই চলেচে। অনেক দিন পরে আজই ও আনন্দ পেয়েচে—নিরানন্দ অসচ্ছল সংসারের একঘেয়ে কর্মের মধ্যে। বালিকাবয়সের শত আনন্দের স্মৃতি নিয়ে পুরোনো দিনগুলো হঠাৎ আজ সন্ধ্যায় কেমন ক'রে ফিরেচে।

ঘণ্টা দুই পরে কুমীর মা এলেন। বললেন—এই যে, জুটেচ ছুটিতে? আমি শুনলুম দিদির মুখে যে হীরু এসেচে। কাল লক্ষ্মীপূজো, তাই রায়েদের বাড়ি রান্না করে দিয়ে এলাম। তা ভালো আছিস্ বাবা হীরু? কুমী কত তোর কথা বলে। তোর কথা লেগেই আছে ওর মুখে; এই আজও দুপুর বেলা বলছিল, মা, হীরুদা নদীতে বন্যা দেখলে খুশি হোত; এবার তো বন্যা এসেছে, হীরুদা যদি দেখতো, খুব খুশি হোত—না মা? তা, আমি তুই এসেছিস্ শুনেই দিদির ওখানে গিয়েছিলুম। বাড়ি নেই দেখে ভাবলাম সে ঠিক আমাদের ওখানে গিয়েচে।

তা ব'স বাবা, চট্‌ করে পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে আসি। গামছাখানা দে তো কুমী। খোকার জন্য তরকারী এনেছি কাঁসিতে। ওকে ভাত দে। এই ওর বিয়ে দিয়েছি সামটায়—বুঝলে বাবা হীরু? জামাই দোকানে সামান্য মাইনেয় খাতা-পত্র লেখা কাজ করে। তাতে চলে না। তার ওপর দজ্জাল ভাই-বৌ। খেতে পর্যন্ত দেয় না ভালো করে মেয়েটাকে। এই দেখো—এখানে এসেচে আজ পাঁচ মাস, নিয়ে যাবার নামটি নেই, বৌদিদির হুকুম হবে তবে বৌ নিয়ে যেতে পারবে। আর এদিকে তো আমার এই অবস্থা, মেয়েটার পরণে নেই কাপড়, জামাই আসে যায়, কাপড়ের কথা বলি, কানেও তোলে না। আমি যে কি ক'রে চালাই? তা সবই অদৃষ্ট! নইলে—

কুমী ঝাঁজালো সুরে বললে—আঃ যাও না, গা ধুয়ে এসো না—কি বকবক শুরু করলে—

অদৃষ্ট, হাঁ অদৃষ্টই বটে। সে আজ কোথায়, আর কুমী কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে। পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, জীবনে আনন্দ নেই, সাধ-আহ্লাদ নেই, কিছুই দেখলে না, কিছুই ভোগ করলে না, সবই অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

খানিক রাত্রে হীরু উঠল। কুমী প্রদীপ ধরে এগিয়ে দিলে পথ পর্যন্ত। বললে—আমাদের হারিকেন লণ্ঠন নেই, একটা পাকাটি জ্বেলে দিই, নিয়ে যাও হীরুদা, বাঁশবনে বড্ড অন্ধকার।

সকালে কুমী পিসিমার বাড়ি এসে ডাক দিলে—কি হচ্চে ও হীরুদা—

—এই যে কুমী, কামিয়ে নিলাম। এইবার নাইবো।

কুমী ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—কেন, কিসের তাড়া নাইবার এত সকালে? তোমার কিন্তু আজ যাওয়া হবে না হীরুদা—বলে দিচ্চি। আজ ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপুজোর অরন্ধন, তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলুম আমাদের বাড়ি। মা বললেন—যা গিয়ে বলে আয়।

হীরু আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, কুমীর কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই সে জানে। কুমী খানিকটা পরে বললে—আমার অনেক কাজ হীরুদা, আমি যাই। তুমি নেয়ে সকালে সকালে এস।

হীরু বেলা দশটার মধ্যে ওদের বাড়ি গেল। আজ আর রান্নার হাঙ্গামা নেই। কুমী বললে—আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে জানো তো? আর কচুর শাক—আর একটা কি জিনিস বলো তো? …উঁহু…তুমি বলতে পারবে না।

কুমীর মা বললেন—কাল রাত্রে তুই চলে গেলে মেয়ে অত রাত্রে তোর জন্য নারিকেল-কুমড়ো রাঁধতে বসল। বললে, হীরুদা বড় ভালোবাসে মা, কাল সকালে খেতে বলব, রেঁধে রাখি।

কুমী স্নান সেরে এসে একখানা ধোয়া শাড়ি পরেচে, বোধহয় এইখানাই তার একমাত্র ভালো কাপড়। সেই চঞ্চলা মুখরা বালিকা আর সে সত্যিই নেই, আজ দিনের আলোয় কুমীকে দেখে ওর মনে হ'ল—কুমীর চেহারা আরও সুন্দর হয়েচে, তবে ওর মুখে চোখে একটা শান্ত মাতৃত্বের ভাব ফুটে উঠেচে, যেটা হীরু কখনো ওর মুখে দেখে নি। কুমী অনেক ধীর হয়েচে, অনেক সংযত হয়েচে। মাথায় সেই রকমের এক ঢাল চুল, মুখশ্রী এখনও সেই রকম লাবণ্যময়।

তা ব'স বাবা, চট্ করে পুকুর থেকে কাপড় কেচে গা ধুয়ে আসি। গামছাখানা দে তো কুমী। খোকার জন্য তরকারী এনেছি কাঁসিতে। ওকে ভাত দে। এই ওর বিয়ে দিয়েছি সামটায়—বুঝলে বাবা হীরু? জামাই দোকানে সামান্য মাইনেয় খাতা-পত্র লেখা কাজ করে। তাতে চলে না। তার ওপর দজ্জাল ভাই-বৌ। খেতে পর্যন্ত দেয় না ভালো করে মেয়েটাকে! এই দেখো—এখানে এসেচে আজ পাঁচ মাস, নিয়ে যাবার নামটি নেই, বৌদিদির হুকুম হবে তবে বৌ নিয়ে যেতে পারবে। আর এদিকে তো আমার এই অবস্থা, মেয়েটার পরণে নেই কাপড়, জামাই আসে যায়, কাপড়ের কথা বলি, কানেও তোলে না। আমি যে কি ক'রে চালাই? তা সবই অদৃষ্ট! নইলে—

কুমী ঝাঁজালো সুরে বললে—আঃ যাও না, গা ধুয়ে এসো না —কি বকবক শুরু করলে—

অদৃষ্ট, হাঁ অদৃষ্টই বটে। সে আজ কোথায়, আর কুমী কোথায় পড়ে কষ্ট পাচ্চে। পরণে কাপড় নেই, পেটে ভাত নেই, জীবনে আনন্দ নেই, সাধ-আহ্লাদ নেই, কিছুই দেখলে না, কিছুই ভোগ করলে না, সবই অদৃষ্ট ছাড়া আর কি?

খানিক রাত্রে হীরু উঠল। কুমী প্রদীপ ধরে এগিয়ে দিলে পথ পর্যন্ত। বললে—আমাদের হারিকেন লণ্ঠন নেই, একটা পাকাটি জ্বেলে দিই, নিয়ে যাও হীরুদা, বাঁশবনে বড্ড অন্ধকার।

সকালে কুমী পিসিমার বাড়ি এসে ডাক দিলে—কি হচ্চে ও হীরুদা—

—এই যে কুমী, কামিয়ে নিলাম। এইবার নাইবো।

কুমী ঘরের মধ্যে ঢুকে বললে—কেন, কিসের তাড়া নাইবার এত সকালে? তোমার কিন্তু আজ যাওয়া হবে না হীরুদা—বলে দিচ্চি। আজ ভাদ্রমাসের লক্ষ্মীপুজোর অরন্ধন, তোমায় নেমন্তন্ন করতে এলুম আমাদের বাড়ি। মা বললেন—যা গিয়ে বলে আয়।

হীরু আর প্রতিবাদ করতে পারলে না, কুমীর কাছে প্রতিবাদ করে কোনো লাভ নেই সে জানে। কুমী খানিকটা পরে বললে—আমার অনেক কাজ হীরুদা, আমি যাই। তুমি নেয়ে সকালে সকালে এস।

হীরু বেলা দশটার মধ্যে ওদের বাড়ি গেল। আজ আর রান্নার হাঙ্গামা নেই। কুমী বললে—আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে জানো তো? আর কচুর শাক—আর একটা কি জিনিস বলো তো? ...উঁহু...তুমি বলতে পারবে না।

কুমীর মা বললেন—কাল রাত্রে তুই চলে গেলে মেয়ে অত রাত্রে তোর জন্য নারিকেল-কুমড়ো রাঁধতে বসল। বললে, হীরুদা বড় ভালোবাসে মা, কাল সকালে খেতে বলব, রেঁধে রাখি।

কুমী স্নান সেরে এসে একখানা ধোয়া শাড়ি পরেচে, বোধহয় এইখানাই তার একমাত্র ভালো কাপড়। সেই চঞ্চলা মুখরা বালিকা আর সে সত্যিই নেই, আজ দিনের আলোয় কুমীকে দেখে ওর মনে হ'ল—কুমীর চেহারা আরও সুন্দর হয়েচে, তবে ওর মুখে চোখে একটা শান্ত মাতৃত্বের ভাব ফুটে উঠেচে, যেটা হীরু কখনো ওর মুখে দেখে নি। কুমী অনেক ধীর হয়েচে, অনেক সংযত হয়েচে। মাথায় সেই রকমের এক ঢাল চুল, মুখশ্রী এখনও সেই রকম লাবণ্যময়।

তবুও যেন কুমীকে চেনা যায় না, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা কুমী অন্তর্হিত হয়েচে, এখন যে কুমীকে সে দেখচে তার অনেকখানিই যেন সে চেনে না।

কিন্তু খানিকটা বসবার পরে হীরুর এ ভ্রম ঘুচে গেল। বাইরের চেহারাটা যতই বদলে যাক না কেন, তার সামনে যে কুমী বার হয়ে এল, সে সেই কিশোরী কুমী। ওর যেটুকু পরিচিত তা ওর মধ্যে থেকে বা'র হয়ে এল—যেটুকু হীরুর অপরিচিত, তা নিজেকে গোপন রাখলে।

কি চমৎকার কুমীর মুখের হাসি। হীরুর মোহ নেই, আসক্তি নেই, আছে কেবল একটা সুগভীর স্নেহ, মায়া, অনুকম্পা…এ এক অদ্ভুত মনের ভাব, কুমীকে সে সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে তাকে এতটুকু খুশি করবার জন্য।

কুমী কত কি বকচে বসে বসে…পুরোনো দিনের কথা তুলচে কেবল কেবল।

—মনে আছে হীরুদা, সেই একবার জেলেদের বাঁশতলায় আলেয়া জ্বলেছিল—সেও তো এই ভাদ্রমাসে…সেই চারুপাঠ মনে আছে?

হীরুর খুব মনে আছে। সবাই ভয়ে আড়ষ্ট, আলেয়া নাকি ভূত, যে দেখতে যায় তার অনিষ্ট হয়। হীরু সাহস করে এগিয়ে গিয়েছিল দেখতে, কুমীও পিছু পিছু গিয়েছিল।

হীরু বলেছিল—আসছিস্ কেন পোড়ারমুখী, ভূত ধরে খাবে যে—

কুমী ভেংচি কেটে বলেছিল—ইস্! ভূতে ধরে ওঁকে খাবে না—আমাকেই খাবে। আলেয়া বুঝি ভূত? ও তো

একরকম বাপ্প, আমি পড়িনি বুঝি চারুপাঠে? শুনবে বলব···অনেকের বিশ্বাস আছে আলেয়া এক প্রকার ভূতযোনি, বাস্তবিক ইহা তা নয়—

হীরু ধমক দিয়ে বলেছিল—রাখ্ তোর চারুপাঠ—আরম্ভ করে দিলেন এখন অন্ধকারের মধ্যে চারুপাঠ···বলে ভয়ে মরচি···—

পরক্ষণেই কুমী খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিল—কি বললে হীরুদা, ভয়ে মরছো? হি হি—হি হি—এত ভয় তোমার যদি এলে কেন? চারুপাঠ পড়লে ভয় থাকতো না ···চারুপাঠ তো আর পড় নি?

সেই সব পুরোনো গল্প। আলেয়া···আলেয়াই বটে।

কুমীর যে খানিকটা পরিবর্তন হয়েচে তা বোঝা গেল, যখন ও গ্রামের এক বিধবা গরীব মেয়ের কথা তুললে। আগে এসব কথা কুমী বলত না। এখন সে পরের দুঃখ বুঝতে শিখেচে। মুখুয্যে-বাড়ির বড় পুরীপাল্লার মধ্যে হর মুখুয্যের এক বিধবা নাতনী—নিতান্ত বালিকা—কি রকম কষ্ট পাচ্চে, পুকুরঘাটে কুমীর কাছে বসে নির্জনে মৃত স্বামীর রূপগুণের কত গল্প করে—এ কথা কুমী দরদ দিয়ে বলে গেল। সত্যিই মাতৃত্ব ওর মধ্যে জেগেচে, ওকে বদলে দিয়েচে অনেকখানি।

হঠাৎ কুমী বললে—অই দেখো হীরুদা বকেই যাচ্চি। তোমায় যে খেতে দেবো, সে কথা মনে নেই।

তার পরে সে উঠে তাড়াতাড়ি হীরুকে ঠাঁই করে দিয়ে ভাত বেড়ে নিয়ে এল। হাসিমুখে বললে—জামালপুরের বাবুর আজ কিন্তু পান্তা ভাত খেতে হবে। রুচ্‌বে তো

মুখে ! নেবু কেটে দেবো এখন অনেক ক'রে, নারকোল-কুমড়ি আছে, কচুর শাক আছে।

এসব সত্যিই হীরু অনেকদিন খায় নি। যা যা সে খেতে ভালোবাসে, কুমী তার কিছুই বাদ দেয় নি। হীরু আশ্চর্য হয়ে গেল এতকাল পরেও কুমী মনে রেখেচে এ সব কথা।

খেতে বসে হীরু বললে—কুমী, ছেলেবেলা ভালো লাগে, না এখন ভালো লাগে ?

—এ কথার উত্তর নেই হীরুদা। ছেলেবেলায় তোমরা সব ছিলে, সে একদিন ছিল। এখনও তা বলে খারাপ লাগে না—জীবনে নানারকম দেখা ভালো—নয় কি ?

—কুমী, একটা কথার উত্তর দে। তোর সংসারের টানাটানি খুব ?

—কে বললে একথা ? মা বলেছিল সেই তো কাল রাত্তিরে ? ও বাজে কথা, জানো তো মা যত বাজে বকে। বুড়ো হয়ে মার আরও জিব আলগা হয়ে গেছে।

—কুমী, আমার কাছে সত্যি কথা বলবিনে ?

—ঐ, তুমিও পাগলামি শুরু করলে। নাও, খেয়ে নাও —যত বাজে বকতে পারো—মা গো। ··দাঁড়াও, পায়েসটা আনি—কচুর শাক পড়ে রইল কেন অতখানি ?···না সে হবে না—

ছাখ্‌ কুমী, আমার কাছে বেশি চালাকি করিস্‌ নে। তোকে আর আমি জানি নে ? কোদ্‌লার ঘাটে পায়ে খেজুর কাঁটা ফুটে গিয়েছিল, মুখে একটু রা করিস্‌ নি, জান্‌তে দিস্‌ নি কাউকে—

—আবার ?

হীরু চুপ করে গেল। এতখানি ব'লে সে ভালো করে নি, ঝোঁকের মাথায় ব'লে ফেলেচে। কুমী যা ঢাকতে চায়, ও তা বা'র ক'রে কুমীর আত্মসম্মানে ঘা দিতে চায় কেন? ছিঃ—

কুমী বললে—আবার কবে আসবে হীরুদা?

—সত্যি কথা যদি শুনতে চাস্, আমার যেতে ইচ্ছে হচ্চে না কিন্তু।

—আবার বাজে বকতে শুরু করেচ হীরুদা! তোমার যা-কিছু সব সামনে, চোখের আড়াল হ'লে আর মনে থাকে না। আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত বাজে বকুনি—

—তুমি তো জানো না একটুও বাজে বকতে? আমি ইচ্ছে করলে থাকতে পারি নে ভেবেছিস্?

—হাঁ, থাকো না দেখি কাজকর্ম বন্ধ করে। বৌদি এসে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবে না?

—আচ্ছা সে যাক, একটা কথার উত্তর তোকে দিতেই হবে। আমি যদি এখানে থাকি তুই খুশি হোস্?

উঃ, মা গো, মুখ বুজে খেয়ে নাও দিকি? কি বাজে বকতেই পারো?

হীরু দুঃখিত ভাবে বললে—আমার এ কথাটারও উত্তর দিবি নে কুমী? তুই এত বদলে গিয়েছিস্ আমি এ ভাবতেই পারি নে। আচ্ছা, বেশ।

কুমী হেসে প্রায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে বললে—তোমার কিন্তু একটুও বদলায় নি হীরুদা, সেই রকম 'আচ্ছা, বেশ' বলা, সেই রকম কথায় কথায় রাগ করা। আচ্ছা, কি বলব বলো দিকি? তুমি জানো না ও-কথার কি উত্তর আমি দিতে

পারি? ভেবে ভাখো তা হ'লে আমি বদলাই নি, বদলে গিয়েছ তুমি হীরুদা।

—আচ্ছা কুমী, এতটা না বকে সামান্য দু' কথায় শাদা উত্তর একটা দে না কেন? বকুনিতে আমি কি তোর সঙ্গে পারব?

—না, তা তুমি পারবে কেন? বকতে তুমি একটুও জানো না। হাঁ, হই।

—মন থেকে বলচিস্?

—আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করচে হীরুদা, এতটা বদলে গিয়েচ তুমি? যাও—আমি তোমার কোনো কথার আর উত্তর দেবো না। তুমি না নিজের বুদ্ধির বড় অহঙ্কার করতে?

—কুমী, রাগ করিস্ নে। অনেক কাজের মধ্যে থেকে আমার সূক্ষ্ম বুদ্ধিটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যাক্, বাঁচলুম কুমী! পায়েসটা খাও তোমার পায়ে পড়ি। আর বকুনিটা কিছুক্ষণের জন্য ক্ষান্ত রাখো। কিছু তোমার পেটে গেল না এই অনাছিষ্টি বকুনির জন্য।

কুমী পরদিন এসে বিছানা-বাক্স গুছিয়ে দিলে। ঘাট পর্যন্ত এসে ওদের নৌকোতে উঠিয়ে দিলে। নৌকো ছেড়ে যখন অনেকটা গিয়েছে তখনও কুমী ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে।

দু'পাড়ের নদীচর নির্জন! দুপুরের রৌদ্র আজ বড় প্রখর, আকাশ অদ্ভুত ধরনের নীল, মেঘলেশহীন। বন্যার জলে পাড়ের ছোট কালকাসুন্দি গাছের বন পর্যন্ত ডুবে গিয়েছে। কচুরি-পানার বেগুনী ফুল চড়ার ধারে আটকে আছে। সেই সব বন-জঙ্গলময় ডাঙ্গার পাশ দিয়ে চলেছে ওদের নৌকো। ঝোপের তলার ছায়ায় ডাহুক চরছে। বন্যার জলে নিমগ্ন আখের ক্ষেতের আখগাছগুলো স্রোতের বেগে থরথর কাঁপছে।

ছইয়ের মধ্যে পিসিমা ঘুমিয়ে পড়েছেন। নিস্তব্ধ ভাদ্র অপরাহ্ণ। বাইরে নৌকোয় তক্তার ওপর বসে বসে হীরু কত কি ভাবছিল। এ গ্রামে যদি সে থাকতে পারত! মধু ডাক্তারের মতো হাটতলায় ওষুধের ডিস্‌পেন্‌সারি খুলে? ডাক্তারীটা যদি শিখতো সে!

পূজোর বাজারটা ফিরবার সময় করতে হবে কলকাতা থেকে···অন্ততঃ দেড়-শো টাকার বাজার। আসবার সময় খুব উৎসাহ করে সুরমার কাছ থেকে ফর্দ করে নিয়ে এসেছে···

একটা মানুষের মধ্যে মানুষ থাকে অনেকগুলো! জামালপুরের হীরু অন্যলোক, এ হীরু আলাদা। এ বসে বসে ভাবছে, কুমীদের রান্নাঘরে অরন্ধনের নেমন্তন্ন খেতে বসেছিল, সেই ছবিটা। অনবরত ওই একটা ছবিই।···

কুমী বলছে—আমার কথা মনে পড়তো হীরুদা?···

কুমী এখনও কি ঠিক তেমনি হাত-পা নেড়ে কথা বলে···ঠিক সেই ছেলেবেলাকার মতো!···আচ্ছা, আর কারো সঙ্গে কথা ব'লে অমন আনন্দ হয় না কেন? সুরমার সঙ্গেও তো রোজ কত কথা হয়···কই···

রেলের বাঁশির আওয়াজে হীরুর চমক ভাঙলো। ওই স্টেশনের ঘাট দেখা দিয়েছে। সিগ্‌ন্যাল নামানো, বোধ হয় ডাউন ট্রেণটা আসবার দেরি নেই···

# লেখক

রবিবার। মধ্যাহ্নভোজন সমাধা ক'রে একটু ঘুমুবার উদ্যোগ করবো ভাবচি—এমন সময় বাইরে কে ডাকলে—সীতানাথ বাবু বাড়ী আছেন?

কে আবার রবিবার দুপুরে বিরক্ত করতে এল?

ছেলেকে ডেকে বললুম—নিয়ে আয় এখানে, আমি আর উঠতে পারচিনে। একটু পরে ছেলের পিছু পিছু চশমা চোখে ছিপছিপে ফরসা চেহারার একটি ছোকরা ঘরে ঢুকে বিনীত ভাবে প্রণাম করে বললে—আপনারই নাম কি সীতানাথ বাবু—?

বললুম—বসুন, কোথা থেকে আস্‌চেন?

—আজ্ঞে, এই আপনার কাছেই এলাম। আজ আপনি সকালে—ওই ডাক্তারখানায় বসেছিলেন, আমি আর দাদা নাইতে যাচ্ছি, দাদা বললেন—আপনি একজন লেখক। তখন তেল মেখেছিলুম, সে অবস্থায় আপনার কাছে যেতে সাহস করিনি। শুনলুম, আপনি শনি-রবিবারে এখানে আসেন, আজই আবার কলকাতা চলে যাবেন ওবেলা। তাই এখন দেখা করতে এলুম।

আসার উদ্দেশ্য শুনে মনটা প্রসন্ন হ'ল না। নিশ্চয়ই লেখা চাইতে এসেচে। এ পাড়াগাঁয়ের টাউনে কোনো কাগজের উৎপাত ছিল না তো জানি—তবে কি এখানেও কাগজ বার হ'ল?

ছোকরা বিনয়ে সঙ্কুচিত হ'য়ে আস্তে আস্তে চেয়ারে বসল, কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখলুম, এতক্ষণ সে একবারও আমার

মুখ থেকে চোখ ফেরায়নি—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে চেয়ে আছে। একটুখানি চুপ করে থেকে ছেলেটি বললে—আপনার কাছে এলাম, যদি মনে কিছু না করেন তা'হলে বলি।

—বলুন না?

—আমাকে একটু করে লেখা শেখাবেন? আমি এবার বাংলা নিয়ে বি-এ পাস করেচি। এখানকার স্কুলে চাকরি পেয়ে এসেচি। আমার দাদা এখানকার সাবরেজিষ্ট্রার। আমার বড় ইচ্ছে আমি লেখক হই। কিছু কিছু লিখেছিলামও, সেগুলো এনেচি সঙ্গে করে—আপনার সময় হবে দেখবার?

আমার সম্মতি পেয়ে ছোকরা একখানা খাতা ভয়ে ভয়ে আমার হাতে দিয়ে বললে—আই-এ পড়বার সময় লিখেছিলুম। চার-পাঁচটা ছোট গল্প, কতকগুলো কবিতা আর গান আছে।

ও দেখি আমার মুখের দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমি কি মত দিই তাই শোনবার জন্যে। বললুম—মন্দ হয়নি, বেশ লাগল—তবে আপনার গানগুলো—ভালোই হয়েচে!

ছোকরা উৎসাহে ও আগ্রহে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললে—আপনার ভালো লেগেচে?···আচ্ছা, গল্পগুলো? ওগুলোর মধ্যে কিছু দেখলেন?

বিশেষ কোনো ধরা-ছোঁয়া না দিয়ে বললুম—বেশ প্রমিস্ আছে। আপনার বয়েস কম, লিখতে লিখতে হবে।

ছেলেটি যেন আনন্দ কোথায় রাখবে ভেবে পেলে না। বললে, দেখুন আমার অনেকদিন থেকে সাধ আমি একজন লেখক হবো। আমি বি-এতে বাংলা নিয়েছিলুম ব'লে বাড়িতে সবাই বকে।

আমার খুড়তুতো ভাইয়েরা বড় বড় চাকরি করে—তারা ভালো ইংরিজী জানে। তারা দাদার কাছে চিঠি লিখলে—ওকে

এখন বাংলা ভুলতে বলো। বাংলা শিখে জীবনে কি হবে? এখন একটু ইংরিজীর দিকে মন দিতে বলো, যদি কিছু উন্নতি করতে চায়। আমি এ সব লিখি ব'লে বাড়ির কেউ সন্তুষ্ট নয়। আমি আবার বাড়ির ছোট ছেলে কিনা। আমি যা লিখি দাদারা দেখতে চায়, লিখতে দেখলে বকাবকি করে। বলে, ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েচে। ও-সব লিখে মিথ্যে সময় নষ্ট করচে।

আমি মনে মনে তাদের খুব দোষী করতে পারলাম না একথা বলার জন্যে।

ছেলেটি আপন মনেই ব'লে যেতে লাগল—এখানে মাস্টারিটা পেয়ে গেলাম, গেজেট যেদিন বার হ'য়েচে, সেই দিনই চাকরি হ'ল আমার। এখানে এসে একা একা বেড়াই; একজনও এমন কেউ নেই যে, দুটো ভাল কথা বলে, কি সৎচর্চা করে। সাহিত্য বিষয়ে কেউ খবরও রাখে না। বড় ব্যাক্‌ওয়ার্ড জায়গা। আপনার সন্ধান পেয়ে ভাবলুম ওঁর কাছে যাই, উনি আমায় লেখা-সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারবেন। তাই এলাম। কারো কাছে উৎসাহ না পেয়ে আমি এমন দমে গিয়েছি, আজ এক বছর লিখিই নি।

তারপর ছোকরা আমায় বেশ বোঝাবার চেষ্টা করলে, সে বর্তমান সাহিত্যের খবর রাখে বা সে সাধারণ মানুষের পর্যায়ের মধ্যে পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, ইবসেন, শ', টলষ্টয়, তরুণ-সাহিত্য, বৈষ্ণব কবিতা—ইত্যাদি হু হু করে মুখস্থ বিদ্যার মতো বলে গেল।

—আচ্ছা, তরুণ-সাহিত্যবাদের মধ্যে রামচন্দ্র সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আপনার মত কি? আমি বিপদে পড়ে গেলুম, তরুণ সাহিত্যবাদের বই কিছু কিছু পড়লেও রামচন্দ্র সরকারের লেখা-সম্বন্ধে আমার কোন ধারণাই নেই। কিন্তু ছেলেটি

যেমন আগ্রহের সঙ্গে এ-সব কথা পড়েছে, তাতে বেশ বুঝা যায়; অনেক দিন পরে একটু উচ্চ বিষয়ে চর্চা করতে পেরে ও খুব খুশি। হয়তো এমন শ্রোতা ওর অনেকদিন জোটে নি।

এ অবস্থায় তাকে নিরুৎসাহ করতে না পেরে রামচন্দ্র সরকার সম্বন্ধে একটা কাল্পনিক মত দেবার চেষ্টা করলুম। আমার কথা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনলে। বললে, আপনি ঠিক বলেছেন। আমার কি মনে হয় জানেন? ইবসেন বলেছেন— তারপর সে খানিকক্ষণ ধরে ইবসেন, মেটারলিঙ্ক, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক নাম অনর্গল আবৃত্তি ক'রে, তাদের নানা মত উদ্ধৃত ক'রে নিজের একটা যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করলে—তার ভাবে মনে হল এ ধরনের কথা বলতেও সে বিশেষ আনন্দ পাচ্ছে—কথা বলতে বলতে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখে—বোধ হয় আমার মুখের ভাব দেখে বোঝবার চেষ্টা করে আমি তার তর্কের ক্ষমতা, পাণ্ডিত্য ও যুক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে কি ভাবচি।

আমি বললাম, এখানে কত দেয় আপনাকে?

—উনত্রিশ টাকা। এখন একরকম কুলিয়ে যায়, দাদার বাসাতে থাকি। কিন্তু দাদা বদলি হ'য়ে গেলে তখন মুশকিল হবে। আমার বাড়িতে কিছু না দিলে তো চলবেই না—

কেন, আপনার দাদারা রয়েচেন?

আমার আপনার দাদা কেউ নেই। ওঁরা সব খুড়তুতো— জ্যেঠতুতো ভাই। আমার বাবা অন্ধ, আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আর একটি বোন, আমার ছোট, তার এখনও বিয়ে হয়নি। দাদারা সব যে যার পৃথক। এক বাড়িতে থাকলেও এক অন্নে নেই।

ও বললে—আমার ছেলেবেলা থেকে সাধ যে, আমার লেখা কাগজে বেরোয়। যখন বড় বড় লেখকদের লেখা দেখতাম, আমার ইচ্ছে হত একদিন আমিও এই রকম লিখব। আমার এক ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল কান্তি বসু—কলকাতায় তার সঙ্গে দেখা এই মাঘ মাসে। আমায় দেখালে "ভারতবর্ষে তার একটা গল্প বেরিয়েছে। মনে মনে বললুম, বা রে!" আমার এমন কষ্ট হ'ল, ওরা সব লেখক হ'য়ে গেল, ওদের লেখা ছাপা হচ্ছে, কত লোক পড়ছে, ভাবুন—কত নাম বেরুবে!

সে খানিকক্ষণ জানালার বাইরে আকাশের দিকে কেমন একটা মুগ্ধ-আকুল সুদূর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তারপর চোখ নামিয়ে বিষণ্ণ মুখে বললে—আর আমার কিছুই হ'ল না।

ওর আন্তরিকতা ও আগ্রহ আমার বড় ভালো লাগল। একটু অন্য ধরনের ছেলে বটে—হয়তো বা একটু মাথা খারাপ আছে। ও যতক্ষণ বসেচে, আমি কেবল লক্ষ্য করচি ওর মুখের ভাবের নানা রকম পরিবর্তন। নির্ভরতার ভয়, শ্রদ্ধা, আশা, আগ্রহ, স্বপ্ন, বিষণ্ণতা, বিভিন্ন ভাব ওর মুখে কেমন চমৎকার ফুটে ওঠে। খুব সাধারণ ধরনের লোকের এ রকম হয় না। পাথর-গড়া মুখের মতো তাদের মুখ হয় দৃঢ়, অপরিবর্তনীয় —ভাব প্রবণতার বালাই তাদের নেই। ওকে উৎসাহ দেবার জন্যে বললাম—আপনি এর পরে নিশ্চয়ই ভালো লিখতে পারবেন। এরই মধ্যে বেশ লেখা বেরিয়েচে আপনার হাত থেকে। এখন আপনার তো বয়েস কম, সারা জীবন পড়ে রয়েছে আপনার সামনে—আমার তো মনে হয়, কালে আপনি একজন ভালো লেখক হবেন—আপনার লেখা পড়ে আমরা এক সময় আনন্দ পাব।

ছোকরা সলজ্জ হাসিমুখে আমার দিকে চেয়ে বললে—কি যে বলেন! আপনারা আনন্দ পাবেন আমার লেখা থেকে!...আচ্ছা, আপনার মনে হয় সত্যি আমার কিছু হবে?

—কেন হবে না? না হবার তো কিছু দেখলুম না—খুব হবে।—কান্তি বসু আমারই ক্লাসফ্রেণ্ড, আমারই মতো বয়েস—ও এরই মধ্যে নাম করে ফেলেচে। আচ্ছা, নাম করতে কতদিন যায়? নাম করবার নিয়ম কি?

আমার দুপুরের বিশ্রামটুকু একেবারেই মাটি হ'ল দেখছি। কি করব উপায় নেই—একে দু'চার কথায় বিদায় দেব ভেবেছিলুম, কিন্তু এর কথা ক্রমশ বেড়েই চলেছে, আবার কোথা থেকে নাম করবার নিয়ম এনে ফেললে। অথচ কেমন একটা অনুকম্পা হ'ল ওর ওপর, ভালো মনে কথার জবাব না দিয়েও পারলুম না। বললাম—তার কি কোন নিয়ম আছে, তা নেই। দু'চারটে ভালো লেখা বেরুতে বেরুতে ক্রমশ নাম বেরোয়। লোকে আপনার লেখা প'ড়ে যদি খুশি হয়, তবে নাম বেরুতে আর কি দেরি হবে?

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে আমার দিকে চেয়ে আনন্দ-সুরে বললে—অনেকদিন থেকে আমার ইচ্ছে কোন লেখকের সঙ্গে আলাপ করি। কলকাতায় থাকতে একবার দেবব্রত মুখুয্যের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তখন দেবব্রত বাবুর 'অপরিণত' বইটা সবে বেরিয়েচে—সারা রাত ধরে জেগে বইখানা পড়লাম, এমন ভালো লাগল আর এমন একটা ইন্‌স্পিরেশন্ পেলাম—তার পরদিন আমিও একখানা ওই রকম নভেল লিখব ভাবলাম। আট-দশ চ্যাপ্টার লিখেও ফেললাম। কান্তিকে দেখাতে গেলাম, সে বললে এর প্লট, ভাব, ভাষা, সব নাকি

দেবব্রত বাবুর বইখানার মতো হচ্চে। আমার ঐ এক দোষ—যখন যেই বই পড়ি, লিখতে বসলে সেই বইখানার মতো প্লট আর ভাষা হ'য়ে যায়। তা সেদিন দেবব্রত বাবুর সঙ্গে দেখা হ'ল না, তিনি ওপর থেকে বলে পাঠালেন তিনি বড় ব্যস্ত।

তাকে উৎসাহ দেবার জন্যে তার একটা গান আবার উল্টে পড়তে লাগলাম। সে হাসি-হাসি মুখে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ও গানটা-সম্বন্ধে আমার প্রশংসার পুনরাবৃত্তি, অত্যন্ত আগ্রহ ও আনন্দের সঙ্গে শুনলে—জীবনে বোধ হ'ল এই সর্ব-প্রথম নিজের লেখাব প্রশংসা শুনচে। কাথাবার্তার মধ্যেও একবার ঘরের চারি ধারে আর একবাব আমার মুখের দিকে চেয়ে খুশির সুরে বললে—আমি কোন লেখকের এত কাছে ব'সে কখনো গল্প করিনি। এত বেশীক্ষণ আমার সঙ্গে কেউ কথাও বলেনি।

আর মিনিট কুড়ি পরে সে অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতা-পত্র গুটিয়ে নিয়ে উঠল—ভাবলে বোধ হয় আর বেশীক্ষণ থাকলে আমি পাছে বিরক্ত হই।

দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়ে কি ভেবে আবার বসল, ভয়ে ভয়ে বললে—একটা কথা বলব? কথাটা বলতে সাহস হয় না। অত কম টাকায় কি আপনি রাজী হবেন? আমি আপনাকে দশ টাকা ক'রে মাসে মাসে দিলে, আমাকে লেখা শিখিয়ে দেবেন?

ওর এই কথাটায় কেমন একটা কষ্ট হ'ল ওর জন্যে। মাত্র উনত্রিশ টাকা মাইনে থেকে আমায় দশ টাকা দিতে রাজী—বাকি উনিশ টাকাতেই এখানকার ও বাড়ির খরচ চালাতে রাজী—লেখক হবার এতই সাধ।

আমি তাকে বললাম—তার কোন টাকাকড়ি লাগবে না। আমি সব ছুটিতে এখানে আসিনে, যখন আসব, তখন আমার দ্বারা যতদূর উপকার হয়, খুশির সঙ্গে করব।

সে মহা আনন্দ ও উৎসাহের সহিত খাতা-পত্র বগলে নিয়ে প্রণাম ক'রে ঘর থেকে বার হ'য়ে গেল। বাইরে গিয়ে আবার জানালার কাছে দাঁড়িয়ে বললে—তা হ'লে আমার হবে? না হবার কিছু দেখলেন কি?—

হবে নিশ্চয়ই, না হবার কিছুই দেখিনি। তবে সাধনা চাই।

ভগবান আমায় যেন ক্ষমা করেন—এই মিথ্যে বলবার জন্যে। আমি কেমন ক'রে ওর মুখের উপর বলবো যে, ওর লেখার মধ্যে আমি কিছুই পাইনি—ওর গল্প, কবিতা নিতান্ত বাজে হ'য়েচে, বিশেষ কোনো ক্ষমতার অঙ্কুরও তার লেখার মধ্যে কোথাও নেই! মিথ্যা যেখানে মানুষকে সুখী করে, সেখানে নিষ্ঠুর সত্য ব'লে কিইবা লাভ?

## বড়বাবুর বাহাদুরি

আপিসে মাঝে মাঝে নানা পার্টি আসিয়া গোলঞ্চ লতা ও গাছ-গাছড়া বিক্রি করিয়া যাইত। ইহাদের নাম লেখা আছে বটে, কিন্তু অনেকেরই ঠিকানা কিছু লেখা থাকে না। এখানে ছোট-খাটো কাজকর্ম সবই হয় নগদ—বড়বাবুর এসিষ্ট্যাণ্ট, সে সব পাওনাদাবকে সাহেব তো দূরের কথা, বড় বাবুর কাছে পর্যন্ত যাইতে দেয় না।

হরিপদ এবার নগু দালালেব হাত দিয়া জিনিস না বেচিয়া নিজেই সরাসরি কোম্পানীব আপিসে লইয়া গিয়া নামাইয়াছিল।

যে পাড়াগাঁয়ে হরিপদ থাকে, গাছ-গাছড়ার সেখানে অভাব নাই। নগু দালালের পবামর্শেই সে এই সব গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করিতে আরম্ভ কবে। তাহাকে সে সব চিনাইয়াছিল শান্তি কবিরাজ।

মন পিছু দু'টাকা লরি ভাড়া দিয়া বাব বাব মাল আনিয়া পোষায় না। হরিপদ সেজন্য এক বছব ধরিয়া বিস্তর গাছপালা মজুদ করিতেছিল। নগু দালাল ইহার মধ্যে দু'তিনবার সন্ধান লইয়াছেও।

—ওহে হরিপদ, মালগুলো এবার দেখচি তুমি পচাবে। আপাং শিমুলের শেকড়, শ্বেতপর্পটি এ সব ছ'মাসের বেশি থাকে না, পচে' নষ্ট হয়ে যায়। তখন দু'খানা করেও বিক্রি হবে না। নিয়ে এসো হে, নিয়ে এসে ফেল কলকাতায়—।

কিন্তু হরিপদ খুব কাঁচা ছেলে নয়।

বেলেঘাটায় মুখুয্যে মশায়ের আড়তে সে আর যাইতে প্রস্তুত নয়। অবিশ্যি এ কথা ঠিক যে, তাহার থাকিবার ও খাইবার কোনো কষ্ট কলিকাতায় হয় না। আজকাল আড়তে উঠিলেই হইল। আড়তের রাঁধুনী বামুন তাহাকে চিনে, তাহাকে গিয়া বলিলেই হইল—ও কুবের ঠাকুর! এখানে দুটো খাব এ বেলা।

উহারা যতই খাতির করুক, এবার হরিপদ বেলেঘাটার আড়তে গিয়া উঠে নাই।

নগু দালাল তো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া গাছ-গাছড়া সংগ্রহ করে, তাহাকে সে লাভের একটা মোটা অংশ কেন দিতে যাইবে?

কলিকাতায় এবার আসিয়া সে শুনিল, হিন্দুস্থান কেমিক্যাল্ কোম্পানী শীতের মরসুমে এই রকম গাছ-গাছড়া কিনিয়া থাকে।

সে সোজা গিয়া হাজির হইল হিন্দুস্থান কেমিক্যাল্ কোম্পানীব আপিসে। প্রচণ্ড ব্যাপার। লোকজন, লিফ্‌ট্, দরওয়ান, ঘোরানো দরজা, দিনমানে ইলেক্‌ট্রিক্ আলো জ্বালিয়া কাজ চলিতেছে। ঘন ঘন টেলিফোন বাজিবার শব্দ। এই জন্যেই বোধ হয় নগু দালালের শরণাপন্ন হইতে হয়। এখানে জিনিস বেচা কি পাড়াগাঁয়ে লোকের কর্ম? অবশেষে সন্ধান মিলিল এন্‌কোয়ারী আপিস থেকে।

জিনিস ক্রয় করিবার ভার যার উপর, তার বয়েস খুব বেশি নয়। লোকটা মাল দেখিয়া শুনিয়া যা দর বলিল, বেলেঘাটা মুখুয্যে মশায়ের আড়তের দরের তুলনায় মনপিছু অন্ততঃ আট আনা বেশি।

মাল নামাইয়া ওজন করিয়া দিতে দেরি হইয়া গেল। কেরানী বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল—আপনি চেক নেবেন, না নগদ

টাকা? কাল এসে টাকা নিয়ে যাবেন তবে। আজ ক্যাশ থেকে টাকা বের ক'রে রেখে দেব। একটা বিল ক'রে বড় বাবুর কাছে সই ক'রে নিয়ে আসুন। বিলখানা এখানে দিয়ে যাবেন।

পরদিন কাউণ্টারে বেজায় ভিড়। আজ টাকা দিবার দিন, অনেক লোক টাকা লইতে আসিয়াছে। একখানা খামের উপর পাওনাদারের নাম টাইপ করা।

কেরানী বাবু জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি নাম? রামশরণ পাল? —এই নিন্। পাওনাদার একখানা খাম লইয়া চলিয়া যাইতেছে—কেহ কেহ বা খাম খুলিয়া নোটগুলি দেখিয়া লইতেছে।

হরিপদর হাতে কেরানী এমনি একখানা খাম দিল। তার ওপরে লেখা আছে H. P. B. সামান্য চল্লিশ টাকার জন্য খাম খুলিয়া টাকা দেখিয়া লইতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। এত কাণ্ডকারখানা যেখানে, সেখানে কি আর ভুল হইবার সম্ভাবনা আছে? খামের বাহিরে টাইপ কবা অক্ষরে তার নাম লেখা ঠিকই আছে।

কিন্তু শেয়াল দ' স্টেশনে আসিয়া খাম খুলিয়া নোটগুলি কি ভাবিয়া একবার দেখিয়া লইতে গিয়া হরিপদ মাথা ঘুরিয়া সেখানে বসিয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া সে তাড়াতাড়িই নোটের খামখানা পকেটে পুরিয়া সোজা প্যাটফর্মে ঢুকিয়া ট্রেণে চড়িয়া বসিল। শীতকালেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল। সর্বনাশ! সব ক'খানাই একশো টাকার নোট, সর্বশুদ্ধ এগারো খানা। চল্লিশ টাকার জায়গায় এগারশো টাকা!

এ ভুল কি করিয়া হইল হরিপদ বুঝিতে পারিল না।

হয়তো তাড়াতাড়িতে অন্য কোনো বড় পাওনাদারের খাম তাহাকে দিয়াছে। তাহারও নাম বোধ হয় H. P. B. অত ভিড়ের মধ্যে কেরানী বাবু কাহার নামের খাম কাহাকে দিয়াছে।

এগারশো টাকা তাহার নিকট অ-নে-ক টাকা। সামান্য অবস্থার মানুষ সে, গাছ-গাছড়া বেচিয়া সংসার চালায়! ভগবান দিয়া দিয়াছেন—উঃ, আর কি সময়েই দিয়াছেন—ভগবানের দান ত! সারা-জীবন গাছ-গাছড়া বিক্রয় করিয়াও সে এগারোশো টাকা জমাইতে পারিত না। আর একসঙ্গে নগদ এতগুলি টাকা হাতে পাওয়া কি সোজা কথা? কার মুখ দেখিয়াই না সে উঠিয়াছিল!

ট্রেণে যাইতে যাইতে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া তাহার উত্তেজনা অনেকটা শান্ত হইল। কিন্তু একটা উত্তেজনা তখনও কমিল না—কতক্ষণে স্ত্রীর কাছে কথাটা বলিবে। গাড়ি যেন চলিতে চাহিতেছে না, এত বড় আনন্দের খবর কাহাকেও না জানাইতে পারিয়া, ভগবান জানেন, কি অসহ্য যন্ত্রণা যে তাহার হইতেছে!

গাড়ির কোণে একটা প্রৌঢ় ভদ্রলোক গলায় কম্ফর্টার জড়াইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে গিয়া কথাটা বলিবে।

—দেখুন মশায়, বড় একটা মজা হয়েচে। একটা আপিসে চল্লিশটা টাকা পেতুম, তারা ভুল ক'রে এগারোশো টাকা দিয়েচে। এই দেখুন টাকা।

আপিসের নাম সে তো বলিতে যাইতেছে না?

দরকার নাই, সন্দেহ করিয়া লোকটা যদি পুলিশে খবর দেয়!

আপিসের লোকে নিশ্চয়ই ভুল ধরিয়া ফেলিবে এবং তখনি তাহার সন্ধানে লোক ছুটিবে। ছুটিলেও তাহার ঠিকানা বাহির

করার কোনো উপায় নাই। একশো টাকার নোটগুলি ভাঙ্গাইয়া ফেলিতে হইবে। সিরাজগঞ্জে তাহার মামা পাটের আপিসে কাজ করেন, মামার সাহায্যে একশো টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া খুচরা দশ টাকার নোট সংগ্রহ করিতে হইবে। কালই সকালের ট্রেণে সিরাজগঞ্জ রওনা হওয়া দরকার।

হরিপদর স্ত্রী আশালতা নোটের তাড়া দেখিয়া অবাক্ হইয়া স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিল। বলিল—হ্যাঁগা, তারা বুঝতে পারলে না, ভুল ক'রে কার টাকা কাকে দিলে!

বড় বড় আপিসের মজাই তো তাই। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো। এদিকে এক এক ডিপার্টমেন্টে পঞ্চাশ ষাট একশো লোক খাটচে, আর ওদিকে এই কাণ্ড। বড়বাবুর কাছে যাও, বিল সই করে নিয়ে এসো, ক্যাশ লও, আবার সই করাও। সব মিথ্যে জাঁকজমক আর কেতা-দুরস্ত।

আশালতা বলিল, কিন্তু ওসব নোটের শুনেচি নম্বর থাকে, যদি পুলিশে হুলিয়া করে দেয়, তুমি নোট ভাঙ্গাবে কি করে? ওইখানেই তো ভয়!

কিছু ভয় নেই। প্রথম তো আজকাল একশো টাকার নোটে নম্বর থাকে না শুনেচি। অত বড় আপিসে একশো টাকার যে সাধারণ নম্বর থাকে, তা টুকে রাখবে না। আর তা ছাড়া কালই সিরাজগঞ্জে গিয়ে মামার কাছ থেকে সব নোট ভাঙ্গিয়ে আনচি। আমার ঠিকানা ওদের কাছ নেই যে ধরবে। নাম দেখে ধরতে পারবে না।

হরিপদর স্ত্রী বলিল—ভালোয় ভালোয় নোটগুলো ভাঙ্গিয়ে তো আনো। সামনের পুন্নিমের দিন সত্যনারায়ণের শিন্নি দিয়ে দিই। ও টাকা ভগবান আমাদের মুখ চেয়েই দিয়েছেন।

সিরাজগঞ্জে গিয়া টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিতে কোনো বাধা হইল না। কথা ফাঁস করিতে নাই, চতুর হরিপদ আমাকে বলিল, ব্রহ্মোত্তর ধানের জমিগুলো সব বেচে দিলুম। কি করি, একটা ব্যবসা খুলব, টাকা যোগাড় করি কোথা? সত্যনারায়ণের শিন্নি দেওয়াও ভুলিয়া গেল।

মাস খানেক কাটিয়া গিয়াছে। অন্য কোনো দিক হইতেই হাঙ্গামা বাধে নাই বটে, কিন্তু হরিপদ বড় বিপদে পড়িয়াছে, এই এক মাস তাহার মনের দিক হইতে একটা বড় গোলমাল বাধিয়া গিয়াছে। এই টাকাটা লইয়া সে কি ভালো করিল!

আপিসের তাহারা এতদিন তাহাদের ভুল নিশ্চয়ই জানিয়া ফেলিয়াছে। তাহার খোঁজও করিয়াছে। কিন্তু কোথায় পাইবে তাহার পাত্তা। সেই কেরানী বাবুর উপরে নিশ্চয়ই সব দায়িত্ব পড়িয়াছে এবং এতদিন বেচারীর চাকরি আছে কিনা সন্দেহ।

যতই দিন যাইতে লাগিল, হরিপদ ততই মনে অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল। যতদিন পুলিশের ভয় ছিল, বা আপিস হইতে তাহার টাকা কাড়িয়া লইবার ভয় ছিল, ততদিন তাহার মনে এ কথা ওঠে নাই যে, এ টাকা লওয়া অন্যায় বা পাপ। কিন্তু এ সম্বন্ধে যতই সে নিজেকে নিরঙ্কুশ বোধ করিতে লাগিল, ততই মনে হইতেছিল এ টাকায় তাহার কোনো অধিকার নাই, এ অপরের টাকা সে চুরি করিয়া আনিয়াছে।

ছ'মাস কাটিয়া গেল; কখনো সে ভাবে, টাকাটা ফিরাইয়া দিব; আবার পরদিনই মনে হয় এই এগারোশো টাকায় একখানি মুদীর দোকান খুলিয়া গ্রামে বসিয়াই সে চমৎকার চালাইতে পারে। ভগবান তাহাদের দুঃখ দেখিয়া মূলধন যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। থাক্, টাকাটা।

টাকা ফেরত দেওয়ার একটা প্রধান বাধা দাঁড়াইয়াছে হরিপদর স্ত্রী। সে যেদিন হইতে শুনিয়াছে স্বামী টাকা ফেরত দেওয়ার সংকল্প করিতেছে, সেদিন হইতে সে কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ বাধাইয়াছে। গরীবের ঘরের মেয়ে, গরীবের ঘরের বৌ—তার কাছে এগারোশো টাকা একটা খুব বড় ব্যাপার।

হরিপদ তাহাকে বুঝাইয়া বলিল—ছাখো, ফাঁকির টাকা তো বটে! এতদিন কথাটা ভালো করে বুঝিনি, আজকাল রাত্রে আমার ঘুম হয় না ভেবে ভেবে তা জানো? কাজ নেই বাপু, এগারোশো টাকা ক'দিন খাব? ওটা তাদের দিয়েই আসি।

আশালতা বলিল—ফাঁকির টাকা হ'ল কি ক'রে? ভগবান না দিলে তাদেরই বা ভুল হবে কেন? ও যখন ঘরে এসেচে, তখন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না, আমার কথা শোনো, ও নিয়ে ভেবে মিথ্যে মাথা খারাপ কোরো না লক্ষ্মীটি। ও তো তুমি কোন একটা লোককে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসোনি, তারা ভুল করে দিয়েচে, এতে তোমার দোষ কি? কারো একজনের টাকা নয়, কোম্পানীর টাকা, বড় লোক কোম্পানী, তাদের কাছে এগারোশো টাকা কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের কাছে অনেক বেশি। সারা জীবনের একটা হিল্লে হয়ে যাবে। আমি কি আমার নিজের জন্যেই বলি, নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখো দিকি? বনে-জঙ্গলে ঘুরে গাছপালা খুঁজে খুঁজে কি ছিরি বেরিয়েচে! ওই টাকায় একখানা দোকান করো, বসে চলবে।

কি ভয়ানক বাধা হইয়া উঠিয়াছে স্ত্রীর এই অনুরোধ! কেন ছাই এ কথা ও স্ত্রীকে বলিতে গিয়াছিল? ওর মুখের

দিকে চাহিলে কষ্ট হয়, ওর কাতর অনুরোধ শুনিলে মনে হয় —দূর করো, কাজ নাই সাধুতা দেখাইয়া। ওই অভাগিনীকে জীবনে কখনো সে সুখী করিতে পারে নাই, টাকাটায় একটা ব্যবসা খুলিয়া দিলে অন্নবস্ত্রের কষ্টের একটা মীমাংসা হইবে। এখানে সাধু সাজা স্বার্থপরতা, ঘোর স্বার্থপরতা।

আশালতার বয়েস কম, জীবনে কোনো সাধ ওর পূর্ণ হয় নাই। ওর মুখের দিকে চাহিয়া না হয় সে নিজের কাছে অসাধুই হইয়া রহিল।

দিনে এই সব ভাবে, কিন্তু গভীর রাত্রে যখন গ্রাম নিষুতি হইয়া যায়, আশালতা ঘুমাইয়া পড়ে, তখন তার মনে হয় চুরির স্বপক্ষে কি চমৎকার যুক্তিই সে বাহির করিয়াছে। জুয়াচুরি জুয়াচুরিই, তার স্বপক্ষে কোনো যুক্তি নাই, তর্ক নাই। টাকা তাকে ফিরাইয়া দিতেই হইবে, নিজের কাছে চোর হইয়া সে থাকিতে পারিবে না।

নিদ্রিত আশালতার মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল—ছি ছি, মেয়েমানুষ জাতটা কি ভয়ঙ্কর! ওদের মনে কি এতটুকু সৎ কিছু মানে না? কেবল টাকা-কড়ি, গহনা, চাল-ডালের দিকে নজর?

দিন যায়। হরিপদ দেখিল, সে স্ত্রীকে মনে মনে অশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহার কত আদরের আশালতা! যাহাকে চোখ ভরিয়া দেখিয়াও চোখের তৃপ্তি হইত না, তাহার সম্বন্ধে এ সব কি ভাবনা তার মনে?

একদিন হঠাৎ তাহাদের একটা বাছুর মরিয়া গেল।

এবার হরিপদ ভাবিল—তা যাবে না? সংসারে যখন ওর মতো মেয়ে এসেচে! তখন ওর পরামর্শেই সংসার এবার উচ্ছন্নে যাবে।

দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণা তাহার বদ্ধমূল হইতে লাগিল। আজকাল স্ত্রীর প্রতি ব্যবহারটা দিন দিন রুক্ষ হইয়া উঠিতেছে। সামান্য কথায় খিটখিট করে, সামান্য ব্যাপার লইয়া স্ত্রীকে দু'কথা শুনাইয়া দেয়। মনের মিলের জোড় ক্রমে অলক্ষিতে খুলিতে লাগিল। আশালতা ভাবিয়া কূল পায় না, তাহার অমন স্বামী কেন এমন হইয়া যাইতেছে দিন দিন? ক্রমে তাহার মনেও ভাঙন শুরু হইল। ভাবে এত হেনস্তা কিসের? কোন্ জিনিসটাতে আমার ত্রুটি হয়? উদয়াস্ত মুখে রক্ত উঠে খেটে মরি, সে কথা একবার বলা তো দূরের কথা, উল্টে আবার পান থেকে চুন খসলেই এই সব গাল-মন্দ, অপমান?

গত মাসখানেক সেই আপিসের টাকাতে হাত পড়িয়াছে। এরই মধ্যে ত্রিশ চল্লিশ টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। আশালতা ভাবে—'ওর শরীরটা খারাপ হয়ে গিয়েচে রোদে রোদে সাত গাঁয়ের বন-জঙ্গলে ঘুরে। ওকে একটু সারিয়ে তুলি।' গত মাস হইতে আশালতা রাত্রে প্রায়ই লুচি ভাজিয়া স্বামীকে খাওয়ায়। মাঝে মাঝে ভালো খাবার-দাবার করে। একদিন বলিল—ওগো, তোমার পায়ের দিকে একবার নজর দাও। এক জোড়া জুতো কিনো দিকি ভালো দেখে। জলে-জলে পা হেজে পাকুই ধরে গেল যে!

একদিন সন্ধ্যার পর হরিপদ খাইতে বসিয়াছে, আশালতা তাহার জন্য দুধ গরম করিয়া আনিতে গিয়াছে। হঠাৎ হরিপদ লুচি চিবাইতে চিবাইতে বেকাদায় জিভ কামড়াইয়া ফেলিয়া যন্ত্রণায় বলিয়া উঠিল—উঃ—

ঠিক সেই সময় আশালতা দুধের বাটি লইয়া আসিয়া বলিল—

কি হ'ল গা? হরিপদ বাঁ হাত দিয়া গলাটা চাপিয়া ধরিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া বসিয়া রহিল, কোন কথা বলিল না।

আশালতা পুনরায় উদ্বেগের সুরে বলিল—কি হয়েচে, হ্যাঁগা? অমন করে আছ কেন? হরিপদ সঙ্গে সঙ্গে রুক্ষস্বরে চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—হবে আর কি, যেদিন থেকে তুমি অলখ্যি ঘরে ঢুকেচ, সেদিন থেকে এ সংসারের ভাস্তি নেই। শুধু শুধু নইলে গরুর বাছুরটাই বা মরে যাবে কেন, আর— বলিয়া লুচির থালা হাতের ঠেলায় সজোরে দশ হাত তফাতে ছিটকাইয়া ফেলিয়া হরিপদ উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

আশালতা দুধের বাটি-হাতে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

হরিপদ অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিল। আসিয়া দেখিল, স্ত্রী বারান্দায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জিবের ব্যথা কমিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছে—ছিঃ, অমন করে তখন বলাটা ভালো হয়নি—নাঃ, একটু বেশি বলা হয়ে গিয়েচে— তখন আর মাথার ঠিক ছিল না তো।—ছিঃ! ঘরে ঢুকিয়া স্ত্রীকে ওভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিল—'নাও ওঠো, রাগ করেচ নাকি? খাওয়া-দাওয়া হয়েচে?' আশালতা ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কোন কথা বলিল না।

হরিপদ স্ত্রীর হাত ধরিয়া উঠাইতে গেল। আশালতা আঁচলে চোখ মুছিয়া বলিল, থাক্, বোসো এখানে, একটা কথা বলি।

কি?

দেখো, সে টাকা তুমি ফেরত দিয়ে এসো। যা খরচ হয়ে গিয়েছে, আমার চুড়ি ক'গাছা বন্ধক দিয়ে হোক, বেচে হোক,

সেটা পুরিয়ে দাও গিয়ে। ওই টাকা যেদিন থেকে ঘরে ঢুকেচে, সেদিন থেকে সংসারের শান্তি চলে গিয়েচে, ও আর কিছুদিন থাকলে একেবারে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি কাল যাও, টাকা ফেলে দিয়ে এসো গিয়ে।

রাত্রিটা কাটিয়া গেলে হরিপদ দেখিল, প্রায় একশো টাকা আন্দাজ খরচ হইয়া গিয়াছে সেই টাকা হইতে। স্ত্রীর গহনা লইয়া সেদিনই সে কলিকাতা রওনা হইল এবং পোদ্দারের দোকানে বেচিয়া টাকাটা সংগ্রহ করিল। কোম্পানীর আপিসে গিয়া ভাবিল, কোনো ছুটো কেরানীর কাছে টাকাটা দেব না,—হিসেবের বাহিরের টাকা সে মেরে দেবে। সে একেবারে সরাসরি বড়বাবুর ঘরে গিয়া হাজির হইল।

বড়বাবু বলিলেন, কি চাই ?

হরিপদ সব খুলিয়া বলিল। ঘরে আর কেহ ছিল না। বড়বাবু আশ্চর্য হইয়া গেলেন। এই টাকা লইয়া আপিসে যথেষ্ট গোলমাল হইয়া গিয়াছে। হরিপদ যাইবার দু'দিন পরে ভুল ধরা পড়ে। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু পারা যায় নাই। যে কেরানী ভুল করিয়াছিল, তাহার মাহিনা হইতে প্রতি মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া কাটিয়া লওয়া হইতেছে এবং পূজার বোনাস্ সে কখনো পাইবে না, এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল।

আজ দু'মাস আড়াই মাস পরে সেই পলাতক লোকটি টাকা ফেরত দিতে আসিয়াছে। ব্যাপারখানা কি ? বড়বাবু এমন কাণ্ড কখনো তাঁহার বাহান্ন বছর বয়সে দেখেন নাই।

জিজ্ঞাসা করিলেন, পুরো টাকাই দেবেন তো ? নিয়ে এসেচেন সব ? তা এতদিন আসেন নি কেন ? হরিপদ বলিল,

যখন টাকাটা এখান থেকে নিয়ে গেলুম, তখন বুঝতে পারিনি যে এত টাকা নিয়ে যাচ্ছি। ধরা পড়ল অনেক পরে বাড়ি গিয়ে। তারপর লোভ প্রবল হয়ে উঠল বড়বাবু, আমরা গরীব লোক, এতগুলো টাকার লোভ সামলানো সোজা কথা তো নয়!

বড়বাবু বলিলেন—বেশ, টাকা দিয়ে যান।

টাকা গুনিয়া দিয়া হরিপদ চলিয়া গেল। আপিসে ইতিমধ্যে অনেকেই কথাটা শুনিয়াছে, তাহারা বড়বাবুর কাছে কথাটা শুনিতে আসিল। এতদিন পরে টাকা ফেরত দিতে আসিল কি ব্যাপার?

বড়বাবু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—হুঁ-হুঁ—তোমরা তো জানো না। কোম্পানীর জন্যে কত খেটে মরি, নামও নেই এ আপিসে, যশও নেই। বাছাধন আজ এতকাল পরে এসেচেন বোধ হয় মাল বিক্রি করতে। ভেবেচেন এতদিনে আর চিনতে পারবে না। জিজ্ঞেস করলুম, আপনার নামটি কি? আপনি একবার জিনিস বেচতে এসে বেশি পেমেণ্ট নিয়ে গিয়েছিলেন না? আমি ওকে বিল সই করতে দেখেচি—চেহারা দেখেই ভাবলুম, এ ঠিক সেই লোক। যেমন বলেচি, বাছাধনের মুখটি চুন। বললুম, টাকা ফেলো, নইলে পুলিশে দেব। ব্যবসাদার লোক, পাওনা টাকা আদায় করেছিল বোধ হয়। সঙ্গে টাকাও ছিল, তা থেকে ভয়ে ভয়ে আমাদের টাকাটা বে'র করে দিলে। যাবে কোথায়? কত বড় ফাঁদে পা দিয়েচে, জানে না।

বড়বাবুর জয় জয়কার পড়িয়া গেল।

## অন্নপ্রাশন

খোকার অবস্থা শেষ রাত থেকে ভালো নয়।

কি যে অসুখ তা-ই কি ভালো করিয়া ঠিক হইল? জগিপুরের সদানন্দ নাপিত এ সব গ্রামে কবিরাজী করে, ভালো কবিরাজ বলিয়া পসারও আছে। সে বলিয়াছিল, সান্নিপাতিক জ্বর। মহেশ ডাক্তারের কম্পাউণ্ডার একটাকা ভিজিটে রোগী দেখে, সে বলিয়াছিল, ম্যালেরিয়া। মহেশ ডাক্তারকে আনিবার মতো সঙ্গতি থাকিলে এতদিন তাহাকে আনা হইত; কাল বৈকালে যে আনা হইয়াছিল সে নিতান্ত প্রাণের দায়ে, খোকা ক্রমশ খারাপের দিকে যাইতেছে দেখিয়া খোকার মা কান্নাকাটি করিতে লাগিল, পাড়ার সকলেও মহেশকে আনিবার পরামর্শ দিল, পরিবারের গায়ের একমাত্র সোনার অলঙ্কার মাকড়ি জোড়াটা বাঁধা দিয়া আটটা টাকা কেশব ঘোড়ার গাড়ির ভাড়া ও ভিজিটেই ডাক্তারের পাদপদ্মে ঢালিয়াছে। তবুও ত' ওষুধের দাম বাকি আছে, নিতান্ত কম্পাউণ্ডারবাবু এখানে ডাকডোক পান, সেই খাতিরেই টাকা-দুই আন্দাজ ওষুধের বিলটা এক হপ্তার জন্য বাকি রাখিতে রাজী হইয়াছেন।

এই তো গেল অবস্থা!

মহেশ ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, কোন আশা নাই। অসুখ আসলে নিউমোনিয়া, এতদিন যা তা চিকিৎসা হইয়াছে। রাতটা যদি বা কাটে, কাল দুপুরে 'ক্রাইসিস্' কাটাইবার সম্ভাবনা কম।

কেশব এ কথা জানিত, কিন্তু স্ত্রীকে জানায় নাই। শেষ

রাত্রের দিকে যখন খোকার হিক্কা আরম্ভ হইল, খোকার মা বলিল—ওগো, খোকার হিক্কা উঠেচে, একটু ডাবের জল দিলে হিক্কাটা সেরে যাবে এখন।

জল দেওয়া হইল, হিচ্‌কী ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কমিবার নামটিও করে না। অতটুকু কচি বালকের সে কি ভীষণ কষ্ট! এক একবার হিচ্‌কী তুলিতে তার ক্ষুদ্র দুর্বল বুকখানা যেন ফাটিয়া যাইতেছে। আর তার কষ্ট দেখা যায় না, তখন কেশবের মনে হইতেছিল, "হে ভগবান্! তুমি হয় ওর রোগ সারিয়ে দাও, নয় তো ওকে নাও, তোমার চরণে স্থান দাও, কচি ছেলের এ কষ্ট চোখের ওপর আর দেখতে পারি নে।"

সূর্য উঠিবার পূর্বেই খোকা মারা গেল।

কেশবের স্ত্রী কাঁদিয়া উঠিতেই পাশের বাড়ি হইতে প্রৌঢ়া বাঁড়ুয্যে-গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন মেয়ে আসিল। সামনের বাড়ির নববিবাহিতা বধূটিও আসিল। বধূটি বেশ, আজ মাস-দুই বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু খোকার অসুখের সময় দুবেলা দেখা শোনা করা, রোগীর কাছে বসিয়া খোকার মাকে স্নানাহারের অবকাশ দেওয়া, নিজের বাড়ি হইতে খাবার করিয়া আনিয়া খোকার মাকে খাওয়ান—ছেলেমানুষ বৌয়ের কাণ্ড দেখিয়া সবাই অবাক্। এখন সে আসিয়া কাঁদিয়া আকুল হইল। বড় নরম মনটা।

দশ মাসের ছেলে মোটে। শ্মশানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই।

খোকাকে কাঁথা জড়াইয়া কেশব আগে আগে চলিল, তার সঙ্গে পাড়ার আরও তিন-চারজন লোক। ঘন বাঁশ বাগান

ও বনের মধ্য দিয়ে শুঁড়ি-পথ। এত সকালে এখনও বনের মধ্যে রৌদ্র প্রবেশ করে নাই, হেমন্তের শিশিরসিক্ত লতাপাতা, ঝোপঝাপ হইতে একটা আর্দ্র অস্বাস্থ্যকর গন্ধ বাহির হইতেছে।

ওপাড়ার সতু বলিল—আর বেশীদুর গিয়ে কি হবে, কি বলো রজনী খুড়ো? এখানেই—

কেশব বলিল—আর একটু চল বিলের ধারে—

বিলের ধারে ঘন বাঁশবনের মধ্যে গর্ত করিয়া কাঁথা-জড়ানো শিশুকে পুঁতিয়া ফেলা হইল। দশ মাসের দিব্যি ফুটফুটে শিশু, কাঁথা হইতে গোলাপ ফুলের মতো ছোট মুখখানি বাহির হইয়া আছে। মুখখানিতে ছোট্ট একটুখানি হাঁ, মনে হইতেছে যেন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেশবের কোলেই ছেলে, গর্তের মধ্যে পুঁতিবার সময় সে বলিল—গা এখনও গরম রয়েচে।

রজনী খুড়ো ইহাদের প্রবীণ, তিনি বলিলেন—আহা-হা, ওসব ভেব না। সতু, নাও না ওর কোল থেকে, ওর কোলে কি বলে রেখে দিয়েচ?

গর্তে মাটি চাপান হইল। কেশব অবাক্ নয়নে গর্তের মধ্যে যতক্ষণ দেখা যায়, চাহিয়া রহিল। ছোট্ট মুঠাবাঁধা হাত ছুটি মাটি চাপা পড়িয়া অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা শেষ হইয়া গেল।

রজনী খুড়ো বলিলেন—চল হে বাবাজী, ওদিকে আর চেও না। সংসার তবে আর বলেচে কেন? আমারও একদিন এমন দিন গিয়েচে, আমার সেই মেয়েটা—জান তো সবাই। আজ আবার তোমার মনিব-বাড়ি কাজ, তোমারও তো সেখানে থাকতে হবে। দেখ ত' দিন বুঝে আজই—

কাজটা সাজ হইয়া গেল খুব সকালেই। বাড়ি যখন ইহারা ফিরিল, তখন সবে রৌদ্র উঠিয়াছে।

একটু পরে সান্ন্যাল-বাড়ি হইতে লোক আসিল কেশবকে ডাকিতে। বলিল—আসুন মুহুরী মশায়, বাবু ডাকচেন। তিনি সব শুনেচেন, কাজকর্ম করলে মনটাতে ভুলে থাকবেন, সেই জন্যে ডেকে নিয়ে যেতে বলে দিলেন।

আজ সান্ন্যাল-বাড়ির মেজবাবুর ছেলের অন্নপ্রাশন। সান্ন্যালেরা গ্রামের জমিদার না হলেও খুব সম্পন্ন গৃহস্থ বটে। পয়সাওয়ালা ও বর্ধিষ্ণু। এ অঞ্চলে প্রতিপত্তিও খুব। তেজারতিতেও ষাট সত্তর হাজার টাকা খাটে। পাশাপাশি আট দশখানা গ্রামে এমন চাষী প্রায় নাই, যে সান্ন্যালদের কাছে হাত পাতে নাই।

কেশব বলিল, চল যাচ্চি, ইয়ে···বাড়িতে একটু শান্ত করে যাই। মেয়েমানুষ, বড্ড কান্নাকাটি করচে।

সান্ন্যালেরা লোক খুব ভাল। বৃদ্ধ সান্ন্যাল মশায় কেশবকে দেখিয়া বলিলেন, আরে এস, এস কেশব। আহা, শুনলাম সবই। তা কি করবে বল। ও দেবকুমার, শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছিল, কি রূপ, তোমার অদৃষ্টে থাকবে কেন? যেখানকার জিনিস সেখানে চলে গিয়েচে! তা ও আর ভেব না, কাজকর্মে থাক, তবুও অনেকটা অন্যমনস্ক থাকবে। দেখ গিয়ে বাড়ির মধ্যে ভাতের উনুনগুলো কাটা হচ্চে কি না। বৌমাকেও আনতে পাঠাচ্চি, তিনিও এসে দেখাশুনো করুন, কাজের বাড়ি ব্যস্ত থাকবেন।

মোটরে করিয়া একদল মেয়ে-পুরুষ কুটুম্ব আসিল।

শহরের লোক। মেয়েদের গহনার বাহার নাই, সে সব বালাই

উঠিয়া গিয়াছে, শাড়ির রঙচঙে চোখ ধাঁধিয়া গেল। মেয়েরা ঠিকই কলিকাতার চাল শিখিয়া ফেলিয়াছে,—কিন্তু এ সব পাড়াগাঁয়ের শহরে পুরুষদের বেশভূষা নিজের নিজের ইচ্ছামত —ধুতির সঙ্গে কোট পরা এখানকার নিয়ম, কেউ তাতে কিছু মনে করে না।

চারিধারে হাসিখুশি, উৎসবের ধূম। কেশবের মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা প্রকাণ্ড বড় ফাঁকা, এদের হাসিখুশির সঙ্গে তার মিল খাইতেছে না। আচ্ছা, এদের মধ্যে কেউই বোধ হয় জানে না, তার আজ সকালে কি হইয়া গিয়াছে···

একটি ভদ্রলোক চাব বছবের একটি ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গাড়ি হইতে নামিলেন। বেশ সুন্দর ফুটফুটে ছেলেটি, গায়ে রাঙা সিল্কের জামা, কোঁচান ধুতি পরনে এতটুকু ছেলের, পায়ে রাঙা মখমলের ওপর জরির কাজ করা জুতো। কি সুন্দর মানাইয়াছে!

কেশবের ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ভদ্রলোকটিকে বলে—শুনুন মশায়, আমারও একটি ছেলে ছিল, অবিকল এমনটি দেখতে। আজ সকালে মারা গেল। আপনার ছেলের মতোই তার গায়ের রং।

মহিমপুরের নিকারীরা মাছ আনিয়া ফেলিল। গোমস্তা নবীন সরকার ডাকিয়া বলিল—ওহে কেশব, চুপ করে দাঁড়িয়ে থেক না, চট্ করে মাছগুলোর ওজনটা একবার দেখে নিয়ে ওদের হাতচিঠেখানা সই করে দাও—দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই—কাতলা আধ মনের বেশি হলে ফেরত দিও—শুধু রুইয়ের বায়না আছে।

নবীন সরকার জানে না তাহার খোকা আজ সকালে মারা

গিয়াছে। কি করিয়া জানিবে, তিন গাঁয়ের লোক, তাতে এই ব্যস্ত কাজের বাড়িতে; সে খবর তাকে দেওয়ার গরজ কার?

কেশব একবার নবীন সরকারকে গিয়া বলিবে—গোমস্তা মশায়, আমার খোকাটি মারা গিয়েছে আজ সকাল বেলা। ফুটফুটে খোকাটি! বড় কষ্ট দিয়ে গিয়েছে।

নবীন সরকার নিশ্চয়ই আশ্চর্য হইয়া যাইবে। বল কি কেশব! তোমার ছেলে আজ সকালে মারা গিয়েছে, আর তুমি ছুটোছুটি করে কাজ করে বেড়াচ্ছ! আহা-হা, তোমার ছেলে! আহা, তাই ত!

কিন্তু কেউ কিছু জানে না। কেশব ত কাহাকেও কিছু বলিবে না।

মাছ ওজন করিয়া লইবার পরে দুধ-দই আসিয়া উপস্থিত! তারপর আসিল বাজার হইতে হরি ময়রার ছেলে, দু'মন-আড়াই মন সন্দেশ ও আড়াই মন পান্তুয়া লইয়া। দই-সন্দেশ ওজন করিবার হিড়িকে কেশব সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সপ বিছান, সামিয়ানা খাটান প্রভৃতি কাজ তদারক করিবার ভারও পড়িল তাহার উপর।

ইতিমধ্যে সকলেই সব ভুলিয়া গেল, একটা বড় গ্রাম্য দলাদলির গোলমালের মধ্যে। সকলেই জানিত, আজ হারাণ চক্রবর্তীর বিধবা মেয়ের কথা এ সভায় উঠিবেই উঠিবে। সকলে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। প্রথমে কথাটা তুলিলেন নায়েব মশায়—তারপরে তুমুল তর্ক-বিতর্ক ও পরিশেষে ওপাড়ার কুমার চক্রবর্তী রাগ করিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে কাজের বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—অমন দলে আমি থাকি নে! যেখানে একটা বাঁধন নেই, বিচার নেই—সে সমাজ আবার সমাজ? যে খায়-

থাক, একটা ভ্রষ্টা স্ত্রীলোককে নিয়ে আমি বা আমার বাড়ির কেউ খাবে না—আমার টাকা নেই বটে, কিন্তু তেমন বাপের —ইত্যাদি।

তিন-চারজন ছুটিল কুমার চক্রবর্তীকে বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করিয়া ফিরাইয়া আনিতে। কুমার চক্রবর্তী যে একরোখা, চড়ামেজাজের মানুষ সবাই তাহা জানে। কিন্তু, ইহাও জানে যে, সে রাগ তার বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। নায়েব মশায় বলিলেন—তুমি যেও না হরি খুড়ো—তোমার মুখ ভালো না, আরও চটিয়ে দেবে। কার্তিক যাক, আর শ্যামলাল যাক—

হারাণ চক্রবর্তীর যে মেয়েটিকে লইয়া ঘোঁট চলিতেছে, সে মেয়েটি কাজের বাড়িতে পদার্পণ করে নাই।

পাশের বাড়ির গোলার নিচে সে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল, আজই একটা মিটিং হইয়া তাহার সম্বন্ধে যে চূড়ান্ত সামাজিক নিষ্পত্তি কিছু হইবে, তাহা সে জানিত এবং তাহারই ফল কি হয় জানিবার জন্যই সে অপেক্ষা করিতেছিল।

হঠাৎ চেঁচামিচি শুনিয়া সে ভয় পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাহারই নাম কুমার চক্রবর্তীর মুখে ওভাবে উচ্চারিত হইতে শুনিয়া পাঁচিলের ঘুলঘুলি দিয়া দুরু দুরু বক্ষে ব্যাপারটা কি দেখিবার চেষ্টা পাইল।

পাঁচিলের ওপাশে নিকটেই কেশবকে দেখিতে পাইয়া সে ডাকিল—কাকা, ও কাকা—

কেশব কাকাকে সে ছেলেবেলা হইতে জানে, কেশব কাকার মতো নিপট ভালোমানুষ এ গাঁয়ে দুটি নাই।

আহা, সে শুনিয়াছে যে, আজই সকালে কেশব কাকার খোকাটি মারা গিয়াছে, অথচ নিজের দুর্ভাবনায় আজ সকাল

হইতে সে এতই ব্যস্ত যে, কাকাদের বাড়ি গিয়া একবার দেখা করিয়া আসিতে পর্যন্ত পারে নাই।

কেশব বলিল—কে ডাকে? কে, বিদ্যুৎ? কি বলচ মা? তা ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

হারাণ চক্রবর্তীর মেয়েটির নাম বিদ্যুৎ। খুব সুন্দরী না হইলেও বিদ্যুতের রূপের চটক আছে সন্দেহ নাই, বয়স এই সবে উনিশ।

বিদ্যুৎ ম্লানমুখে গলার সুমিষ্ট সুরে অনেকখানি খাঁটী মেয়েলী সহানুভূতি জানাইয়া বলিল—কাকা, খোকামণি না কি নেই? আমি সব শুনেছি সকালে। কিন্তু কোথাও বেরুতে পারিনি সকাল থেকে, একবার ভেবেছিলুম যাব।

কেশব উত্তর দিতে গিয়া চাহিয়া দেখে বিদ্যুতের চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। এতক্ষণ এই একটি লোকের নিকট হইতে সে সত্যকার সহানুভূতি পাইল। কেশব একবার গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল—তা যা, এখানে দাঁড়িয়ে থাকিস্ নে—যা। ও ঘোঁটের কথা শুনে আর কি হবে, তুই বাড়ি যা। কুমার চক্কোত্তি রাগারাগি করে চলে গিয়েছে, ওকে সবাই গিয়েছে ফিরিয়ে আনতে। তোর ওপর খুব রাগ কুমারের। তবে ও ত আর সমাজের কর্তা নয়, ওর রাগে কি-ই বা এসে যাবে!

—কি বলছিল ওরা?

—তুই নাকি এখনও গাঙ্গুলী বাড়ি যাস্, তোকে ওদের টিউবকলে জল তুলতে যেতে দেখেছে কুমারের স্ত্রী। কোন্‌দিন নাকি ওদের নারকোল তলায়—ইয়ে, সুশীলের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলি, তাও কুমারের স্ত্রী দেখেছে—এই সব কথা।

বিদ্যুৎ বলিল—আমি যাইনি কাকা, সেবার সেই বারণ করে দেওয়ার পর থেকে আর কক্ষনো যাই নি।

এ কথাটি বিদ্যুৎ মিথ্যা বলিল। সুশীলের সঙ্গে তার ছেলেবেলা হইতেই আলাপ। সুশীল যখন কলেজে পড়িত, তখন বিদ্যুৎ বার তের বছরের মেয়ে। সুশীলদা'র দেখা পাইলে তখন হইতেই সে আর কোথাও যাইতে চায় না।

সুশীলের সঙ্গে তাহার বিবাহ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তাহারা বৈদিক আর সুশীলেরা রাঢ়ীশ্রেণী। বিদ্যুতের বিবাহ হইয়াছিল পাশের গ্রামের শ্রীগোপাল আচার্যের সঙ্গে। বিদ্যুৎ বিধবা হইয়াছে বিবাহের দু' বছর পরেই। শ্বশুরবাড়ি মাঝে মাঝে যায়, কিন্তু বেশির ভাগ এখানেই থাকে। সুশীলের সঙ্গে তাহার ছেলেবেলার মাখামাখি লইয়া একটি অপবাদ গ্রামের মাঝে রটিয়াছিল। এই অপবাদের দরুণই তাহারা এখন গ্রামে একঘরে হইয়া আছে, এ বাড়িতে তাহাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই।

ইতিমধ্যে ঝুমুর গানের দল আসিয়া হাজির হইল। সামিয়ানার একধারে ইহাদের জন্য স্থান নির্দিষ্ট ছিল, গ্রামের ছোট ছেলে-মেয়েরা, দল আসিতেই সেখানে গিয়া জায়গা দখল করিয়া বসিবার জন্য হুড়াহুড়ি বাধাইয়া দিল। কেশব ছুটিয়া গেল গোলমাল থামাইতে। দলের অধিকারী বলিল—ও সরকার মশাই, আমাদের একটু তামাক-টামাকের যোগাড় করে দিন, আর দু-পাঁচ খিলি পান। রোদ্দুরে বামুনগাঁতির বিল পার হতে যা নাকালটা হয়েছে সবাই মিলে!

বেলা বারোটার সময় কেশব একবার বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। স্ত্রীর জন্য তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আহা, বেচারী

এ বাড়ি আসিয়াছে তো,—না, খালি বাড়িতে একা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে ?

না, দেখিয়া আশ্বস্ত হইল স্ত্রী আসিয়াছে ও ইঁদারার পাড়ে একরাশ পুরোনো বাসন ঝিয়েদের সঙ্গে বসিয়া মাজিতেছে, তাহাদের আজ মরণাশৌচ, বাহিরের কাজকর্ম ছাড়া অন্য কাজ করিবার যো নাই।

মেজবাবুর যে-খোকার অন্নপ্রাশন, দালানে খাটের উপর সুন্দর বিছানাতে চারিদিকে উঁচু তাকিয়া ঠেস্ দিয়া তাহাকে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। ন' মাসের হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি শিশু, গায়ে একগা গহনা, সামনের গদীতে একখানা থালে যে সব বিভিন্ন অলঙ্কার আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবে দিয়াছে, সেগুলি সাজান। তিন-চার ছড়া হার, সোনার ঝিনুক, পদক, তাগা, বালা, রূপার কাজল-লতা। চারিধারে ঘিরিয়া মেয়েরা দাঁড়াইয়া আছে, ইহারা কেউ কেউ এ গ্রামের বৌ-ঝি, কিন্তু বেশির ভাগই নবাগতা কুটুম্বিনীর দল। সকাল হইতে বেলা এগারটা পর্যন্ত আপ্-ডাউন যে তিনখানা ট্রেণ যায়, প্রত্যেক ট্রেণের সময়ে দু' তিনখানা ট্যাক্সি বোঝাই হইয়া ইহারা কোন দল কলিকাতা হইতে, কোন দল বা রাণাঘাট, কি গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, কি শান্তিপুর হইতে আসিয়াছে। শহরের মেয়ে, কি সব গহনা ও শাড়ির বাহার, কি রূপ, কি মুখশ্রী, যেন এক একজন এক একখানি ছবি!

খোকাটি কেমন চমৎকার হাসিতেছে। কেমন সুন্দর মানাইয়াছে ওই বেগুনী রংয়ের জামাটাতে। তাহার খোকারও অন্নপ্রাশন দিবার কথা ছিল ন' মাসে।

গরীবের সংসার, খোকার যখন চার মাস বয়স, তখন

হইতে ধীরে ধীরে সব যোগাড় করা হইতেছিল। কাপালীরা মুসুরি ও ছোলা দিয়াছিল প্রায় আধ মন, নাড়ুর চালের জন্য ধান যোগাড় করা হইয়াছিল, সাত-আটখানা খেজুরের গুড় দিয়াছিল বাগদীপাড়ার সকলে মিলিয়া। বৃদ্ধ ভুবন মণ্ডল বলিয়াছিল—মুহুরী মশায়, যত তরিতরকারি দরকার হবে, আমার ক্ষেত থেকে নিয়ে যাবেন খোকার ভাতের সময়। এক পয়সা দিতে হবে না। কেবল বামুন-বাড়ির দুটো পেরসাদ যেন পাই। শূদ্র-ভদ্র সবাই খোকাকে ভালবাসিত।

মেজবাবুর খোকার গায়ের রং অনেক কালো তার খোকার তুলনায়। মেজবাবু নিজে কালো, খোকার খুব ফরসা হইবার কথাও নয়। সুতরাং এদের মানানো শুধু জামায় গহনায়। তাহার খোকা গরীবের ঘরে আসিয়াছিল। এক জোড়া রূপার মল ছাড়া আর কোন-কিছু খোকার গায়ে ওঠে নাই।

আজ শেষ রাত্রে খোকার সেই হিচ্‌কীর কষ্টে কাতর কচি মুখখানি, অবাক্ দৃষ্টি, নিষ্পাপ, কাচের চোখের মতো নির্মল ব্যথাক্লিষ্ট চোখদুটি···আহা, মাণিক রে!

—ও কেশব, বলি হ্যাদ্দেখ্যে এখানে সঙের মতো দাঁড়িয়ে আছ যে! বেশ লোক যা হোক। ব্রাহ্মণদের পাতা করবার সময় হ'ল, সামিয়ানা খাটাবার ব্যবস্থা কর গে। আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি চোদ্দভুবন, আর তুমি এখানে, বেশ নম্বুরী নোটখানি বাবা। পা চালিয়ে দেখ গিয়ে—

নবীন সরকার।

কিন্তু, নবীন সরকার তো জানে না···

সে কি একবার বলিবে?···ও গোমস্তা মশায়, এই আমার

খোকা আজ সকালে…ও রকম ক'রে আমায় ডাকবেন না…
আমার মনটা আজ ভাল না…

দলে দলে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা আসিতে আরম্ভ করিয়াছে নানা গ্রাম হইতে। এগারোখানা গাঁ লইয়া সমাজ, সমাজের সকলেই নিমন্ত্রিত। বড় বৈঠকখানায় লোক ধরিল না, শেষে লিচুতলায় প্রকাণ্ড সতরঞ্চ পাতিয়া দেওয়া হইল। আসরের মধ্যে দাঁড়াইয়া দেউলে সরাবপুরের বরদা বাঁড়ুয্যে মশায় বলিলেন—একটা কথা আমার আছে। এ গাঁয়ে হারাণ চক্কোত্তি সমাজে একঘরে, তাদের বাড়ির কারুর কি নেমন্তন্ন হয়েচে আজ কাজের বাড়িতে? যদি হয়ে থাকে বা তাদের বাড়ির কেউ যদি এ বাড়িতে আজ এসে থাকেন, তবে আমি অন্ততঃ দেউলে সরাবপুরের ব্রাহ্মণদের তরফ থেকে বলচি যে, আমরা এখানে কেউ জলস্পর্শ করব না।

আরও ছ' পাঁচখানা গ্রামের লোকেরা সমস্বরে এ কথা সমর্থন করিল। অনেকে আবার হারাণ চক্রবর্তীর আসল ব্যাপারটা কি জানিতে চাহিল। ছেলে-ছোকরার দল না বুঝিয়া গোলমাল করিতে লাগিল।

এ বাড়ির বৃদ্ধ কর্তা সান্ন্যাল মশায়ের ডাক পড়িল। তিনি কাজের বাড়িতে কোথাও ব্যস্ত ছিলেন, গোলমাল শুনিয়া সভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। এ গাঁয়ের সমাজ বড় গোলমেলে, তাহা তিনি জানিতেন। পান হইতে চুন খসিলেই এই তিনশো নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ এখনই হৈ-চৈ বাধাইয়া তুলিবে, খাইব না বলিয়া শুভকার্য পণ্ড করিয়া দিয়া বাড়ি চলিয়া যাইবে। প্রাচীন, বিচক্ষণ ব্যক্তি সব, কিন্তু সামাজিক ঘোঁটের ব্যাপারে ইহাদের না আছে বিচার-বুদ্ধি, না আছে কাণ্ডজ্ঞান।

তবুও সান্ন্যাল মশায় সভার মধ্যে খুব সাহসের পরিচয় দিলেন। বলিলেন, আপনাদের সকলকেই জানাচ্ছি যে হারাণ চক্কোত্তির বাড়ির একটি প্রাণীও আমার বাড়ি নিমন্ত্রিত নয়, তাদের কেউ এ বাড়িতে আসেনও নি। কিন্তু, আমার আজ অনুরোধ, এই সভাতেই সে ব্যাপারের একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়া দরকার। হারাণ আমার প্রতিবেশী, আমার বাড়ির পাশেই তার বাড়ি। তার ছেলে-মেয়ে আমার নাতি-নাতনীর বয়সী। আজ আমার বাড়ির কাজ, আর তারা মুখ চুন ক'রে বাড়ি বসে থাকবে, এ বাড়িতে আসতে পারবে না, খুদ-কুঁড়ো যা দুটো রান্না হয়েচে তা মুখে দিতে পারবে না, এতে আমার মন ভালো নেয় না। আপনারা বিচার করুন তার কি দোষ—আমাদের গাঁয়ের লোক মিলে আজ সকালে একটা মিটিং আমরা এ নিয়ে করেছিলাম, কিন্তু সকলে উপস্থিত না হ'লে ব্যাপারটা উত্থাপন করা ভালো নয় ব'লে আমরা বন্ধ রেখেছি। আমার যদি মত শোনেন, আমি বলি হারাণ চক্কোত্তির মেয়ে নির্দোষ, তাকে সমাজে নিতে কোন দোষ নেই।

ইহার পর ঘণ্টা-দুই-ব্যাপী তুমুল বাগ্‌যুদ্ধ শুরু হইল, আজ সকাল বেলার মতোই। এই সভায় সবাই বক্তা, শ্রোতা কেহ নাই। চড়া গলায় সকলেই কথা বলে, কথার মধ্যে যুক্তি-তর্কের বালাই নাই। দেখা গেল, এ গাঁয়ের হারাণ চক্রবর্তীর ব্যাপার লইয়া দুটো দল, একদল তাহাকে ও তাহার মেয়েকে একঘরে করিয়া রাখিবার পক্ষে মত দিল। অপর পক্ষ ইহার বিরুদ্ধে। হারাণ চক্রবর্তীর ডাক পড়িল, তাঁর বয়স যদিও খুব বেশি নয়, কিন্তু কানে একেবারে

শুনিতে পান না। টাইফয়েড হইয়া অল্প বয়স হইতেই কান ছুটি গিয়াছে। তিনি হাতজোড় করিয়া নিবেদন করিলেন, তাঁহার মেয়েকে তিনি ভালো রকমই জানেন, তার স্বভাব-চরিত্র সৎ। যে ছেলেটিকে লইয়া এ কথা উঠিয়াছে, গাঙ্গুলী-বাড়ির সেই ছেলেটি কলেজের পাস, উঁচু নজরে কারও দিকে চায় না। ছেলেবেলা হইতেই বিদ্যুতের সঙ্গে তার ভাইবোনের মতো মেশামেশি, এর মধ্যে কেউ যে কিছু দোষ ধরিতে পারে—ইত্যাদি।

ইহার উত্তরে বিরুদ্ধ দলের কর্তা কুমার চক্রবর্তী রাগিয়া উঠিয়া যাহা বলিলেন, তাহা আমাদেব মনে আছে, কিন্তু সে সব কথা পাড়াগাঁয়ের দলাদলি-সভায় উচ্চারিত হইতে পারিলেও ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়।

অনেক করিয়াও হারাণ চক্রবর্তীর হিতাকাঙ্ক্ষী দল কিছু করিতে পারিল না। কুমার চক্রবর্তীর দলই প্রবল হইল। আসলে বিদ্যুৎ যে খুব ভালো মেয়ে, বিদ্যুতের মনটি বড় নরম, পাড়ার আপদে-বিপদে ডাকিলেই ছুটিয়া আসে এবং বুক দিয়া পড়িয়া উপকার করে, তাহার উপর সে ছেলেমানুষ, এখনও তত বুঝিবার বয়স হয় নাই, বৃদ্ধের দলের আসল যুক্তি এই। কিন্তু, এ সত্য কথা সভায় দাঁড়াইয়া বলা যায় না।

কুমার চক্রবর্তীর দলের লোকেরা বলিল—সেবার সুরেনের মেয়ের বিয়ের সময় আমরা তো ব'লে দিয়েছিলাম, বিদ্যুৎ সুশীলদের বাড়ি যাতায়াত বা সুশীলের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করুক। এক বছর আমরা যদি দেখি, সে আমাদের কথা মেনে চলেছে, তবে আমরা তাদের দলে তুলে নেব—কিন্তু সে কি তা শুনেচে?

হারাণ চক্রবর্ত্তী বলিলেন—কৈ কে দেখেছে—বলুক কবে আমার মেয়ে এই এক বছরের মধ্যে—কিন্তু এমন ক্ষেত্রে পাড়া-গাঁয়ে দেখিবার লোকের অভাব হয় না।

দেখিয়াছে বৈ কি! বহু লোক দেখিয়াছে। পরের বাড়ি কোথায় কি হইতেছে দেখিবার জন্য যাহারা ওত পাতিয়া থাকে, তাদের চোখে অত সহজে ধূলা দেওয়া চলে না।

অবশেষে কে বলিল—আচ্ছা, কাউকে দিয়ে সেই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করা হোক না—সে যদি আমাদের সামনে স্বীকার করে, সে ওখানে যাতায়াত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘাট স্বীকার করে, কথা দেয় যে, আর কখনও এ কাজ সে করবে না, তবে না হয়—

বিদ্যুৎ পাঁচিলের ঘুলঘুলিতে চোখ দিয়াই দাঁড়াইয়াছিল।

কেশব গিয়া বলিল—মা আছিস্? রাজী হয়ে যা না, ওরা যা যা বলছে। কেন মিছে মিছে—

বিদ্যুৎ কাঁদিয়া বলিল—আপনি ওদের বলুন আমি সব তাতে রাজী আছি কাকা।

সভার মধ্যে বাবাকে অপদস্থ হইতে দেখিয়া লজ্জায়, দুঃখে সে মরিয়া যাইতেছিল···তার জন্যই তার নিরীহ পিতার এ দুর্দশা···তা ছাড়া তার দাদা শ্রীগোপালের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আজ পাঁচ ছ' দিন হইতে যজ্ঞিবাড়ির নিমন্ত্রণ খাইবার লোভে অধীর হইয়া আছে, ছেলেমানুষ তারা কি বোঝে—অথচ আজ তাদের নিমন্ত্রণ হয় নাই, বাড়িতে আসিতে না পাইয়া মুখ চুন করিয়া বেড়াইতেছে—ইহা তাহার প্রাণে বড়ই বাজিয়াছে।

ছোট মেয়ে সুবু তো কেবলই জিজ্ঞাসা করিতেছে—পিছিমা,

ওদেল বাজি থেকে ডাকতে আছবে কখন? পায়েছ খাব, ছন্দেছ খাব, না পিছি? আমি যাব, ওবু যাবে, দাদা যাবে, মা যাবে—

তার মা ধমক দিয়া থামাইয়া রাখিয়াছে—থাম্, এখন চুপ কর। যখন যাবি তখন যাবি। তা না এখন থেকে—এখন বরং একটু ঘুমো দিকি। ঘুমিয়ে উঠে আমরা সেই বিকেলে তখন সবাই যাব।

ঘরে বাহিরে বিদ্যুতের আর মুখ দেখাইবার যো নাই।

কিন্তু, কেশবের কথায় কি হইবে। এক আধটি বাজে লোকের প্রস্তাবেই বা কি হইবে। বরদা বাঁড়ুয্যে ও কুমার চক্রবর্তী এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। একবার যে শর্ত ভঙ্গ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে আর শর্ত করিয়া ফল নাই। আর এ শর্তের ব্যাপার নয়। একটা স্ত্রীলোককে সামাজিক শাসন করা হইতেছে, ইহার মধ্যে শর্তই বা কিসের? মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া যে গ্রাম হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হয় নাই এতদিন, ইহাই যথেষ্ট।

সুতরাং হারাণ চক্রবর্তী যেমন একঘরে ছিলেন, তেমনই রহিয়া গেলেন।

তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজনের পালা। কেশবের মরণাশৌচ, সে পরিবেশন করিবে না, ভিখারী বিদায়ের ভার পড়িল তার উপর। দু' তিন দফা ব্রাহ্মণ খাওয়ান ও ভিখারী বিদায় করিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে শূদ্রভোজন, সে চলিল রাত দশটা পর্যন্ত।

কেশব সারাদিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যখন খাইতে বসিল, তখন রাত এগারটা। আয়োজন ভালই হইয়াছিল,

কিন্তু এত রাত্রে জিনিসপত্র বেশি কিছু ছিল না। কেবল দই ও মিষ্টি এবং দু'তিন রকমের টক তরকারি দিয়া কেশব পরিতৃপ্তির সঙ্গে দুই জনের আহার একা করিল। পরে স্ত্রীকে লইয়া অন্ধকারেই নিজের বাড়ি রওনা হইল।

কেশবের স্ত্রীও খুব খাইয়াছে। কেশবের প্রশ্নের উত্তরে বলিল—তা গিন্নীর বড় মেয়ে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালে। নিজের হাতে আমার পাতে সন্দেশ দিয়ে গেল। খুব যত্ন করেছে। রান্নাবান্না কি চমৎকার হয়েছে, না?

কেশব বলিল—তা বড়লোকের ব্যাপার, চমৎকার হবে না? নয় ত এমন অসময়ে কপি কোথা থেকে এই পাড়াগাঁয়ে আসে বল দিকি? পেয়েছিলে কপির তরকারি?

—তা আর পাইনি? দু' দুবার দিয়েছে আমার পাতে। হাঁ গা, এখন কপি কোত্থেকে আনালে? কলকাতায় কি বারমাস কপি মেলে?

বাড়ির উঠানে তুলসীতলায় একটা মাটির প্রদীপ তখনও টিমটিম করিয়া জ্বলিতেছে। কেশবের স্ত্রী বলিল—ও বাড়ির ছোট-বৌ জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে, আহা বড় ভালো মেয়ে! আজ সকালে কেঁদে একেবারে আকুল।

সকালে যে ভাবে ইহারা ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, ঘর-বাড়ি সেই ভাবেই পড়িয়া আছে। কারো সাড়া-শব্দ নাই,—নির্জন, নিস্তব্ধ। বাড়িখানা খাঁ খাঁ করিতেছে। আশে পাশে ঘন অন্ধকার, কেবল তুলসীতলায় ওই মিটমিটে মাটির প্রদীপের আলোটুকু ছাড়া।

কেশব শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

অনেক রাত্রে ঘুমের মধ্যে কেশব স্বপ্ন দেখিতেছিল, বিদ্যুৎ

আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া কাঁদ-কাঁদ মুখে বলিতেছে—কাকা, আজই বুঝি…একবার ভেবেছিলাম আসব, কিন্তু যে দুর্ভাবনা আমার ওঁপর দিয়ে আজ সারাদিন…

বাহিরে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে তার ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ধড়মড় করিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিল—সর্বনাশ! ভয়ানক বৃষ্টি আসিয়াছে! খোকা, কচি ছেলে, নিউমোনিয়ার রোগী, বাঁশতলায় তার ঠাণ্ডা লাগিতেছে যে!…পরক্ষণেই ঘুমের ঘোর-টুকু ছুটিয়া যাইতেই নিজের ভুল বুঝিয়া আবার শুইয়া পড়িল।

ভাবিল—আহা, যখন পুঁতি, তখনও ওর গা গরম, বেশ গরম ছিল…হঠাৎ দেখিল সে কাঁদিতেছে, অঝোর ধারে কাঁদিতেছে…বাইরের ঐ বৃষ্টিধারার মতো অঝোর ধারে · বাব বার তার মনে হইতে লাগিল—তখনও ওব গা গরম ছিল… বেশ গবম ছিল…

## তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প

সন্ধ্যা হইবার দেরি নাই। রাস্তায় পুরোনো বইয়ের দোকানে বই দেখিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে আমার এক বন্ধু কিশোরী সেন আসিয়া বলিল, এই যে এখানে কি? চল চল জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়ে আসি। তারানাথ জ্যোতিষীর নাম শোন নি? মস্ত বড় গুণী।

হাত দেখানোর ঝোঁক চিরকাল আছে। সত্যিকার ভালো জ্যোতিষী কখনও দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম—বড় জ্যোতিষী মানে কি? যা বলে তা সত্যি হয়? আমার অতীত ও বর্তমান বলতে পারে? ভবিষ্যতের কথা বললে বিশ্বাস হয় না।

বন্ধু বলিল—চলই না। পকেটে টাকা আছে? দু-টাকা নেবে, তোমার হাত দেখিও। দেখ না বলতে পারে কি না। কাছেই একটা গলির মধ্যে একতলা বাড়ির গায়ে টিনের সাইনবোর্ডে লেখা আছে—তারানাথ জ্যোতির্বিনোদ—

এই স্থানে হাত দেখা ও কোষ্ঠীবিচার করা হয়।

গ্রহশান্তির কবচ তন্ত্রোক্ত মতে প্রস্তুত করি।

আসুন ও দেখিয়া বিচার করুন।

বড় বড় রাজা-মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে। দর্শনী নামমাত্র।

বন্ধু বলিল—এই বাড়ি।

হাসিয়া বলিলাম—লোকটা বোগাস্ এত রাজা-মহারাজা যার ভক্ত, তার এই বাড়ি?

বাহিরের দরজায় কড়া নাড়তেই ভিতর হইতে একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—কে ?

কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—জ্যোতিষী-মশায় বাড়ি আছেন ?

ভিতর হইতে খানিকক্ষণ কোন উত্তর শোনা গেল না। তারপর দরজা খুলিয়া গেল। একটা ছোট ছেলে উঁকি মারিয়া আমাদের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে আসছেন ?

আমাদের আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া সে আবার বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারও কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না।

আমি বলিলাম—ব্যাপার যা দেখছি, তোমার জ্যোতিষী পাওনাদারের ভয়ে দিনরাত দরজা বন্ধ ক'রে রাখে। ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে আমরা পাওনাদার কি না দেখতে। এবার ডেকে নিয়ে যাবে। আমার কথা ঠিক হইল। একটু পরেই ছেলেটি দরজা খুলিয়া বলিল, আসুন ভেতরে।

ছোট একটা ঘরে তক্তাপোশের উপর আমরা বসিলাম। একটু পরে ভিতরের দরজা ঠেলিয়া একজন বৃদ্ধ প্রবেশ করিল। কিশোরী উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—পণ্ডিতমশায় আসুন।

বৃদ্ধের বয়স ষাট-বাষট্টির বেশি হইবে না। রং টকটকে গৌরবর্ণ, এ-বয়সেও গায়ের রঙের জৌলুস আছে। মাথায় চুল প্রায় সব উঠিয়া গিয়াছে। মুখের ভাবে ধূর্ততা ও বুদ্ধিমত্তা মেশানো, নিচের চোয়ালের গড়ন দৃঢ়তাব্যঞ্জক। চোখ দুটি বড় বড় উজ্জ্বল। জ্যোতিষীর মুখ দেখিয়া আমার লর্ড রেডিঙের চেহারা মনে পড়িল—উভয় মুখাবয়বের আশ্চর্য সৌসাদৃশ্য আছে।

কেবল লর্ড রেডিঙের মুখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আরও অনেক বেশি। আর ইহার চোখের কোণের কুঞ্চিত রেখাবলীর মধ্যে একটু ভরসা-হারানোর ভাব পরিস্ফুট। অর্থাৎ যতটা ভরসা লইয়া জীবনে নামিয়াছিলেন, এখন তাহার যেন অনেকখানিই হারাইয়া গিয়াছে, এই ধরনের একটা ভাব।

প্রথমে আমিই হাত দেখাইলাম।

বৃদ্ধ নিবিষ্টমনে খানিকটা দেখিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার জন্মদিন পনরই শ্রাবণ, তের-শ পাঁচ সাল। ঠিক? আপনার বিবাহ হয়েছে তের-শ সাতাশ সাল, ঐ পনরই শ্রাবণ। ঠিক? কিন্তু জন্মমাসে বিয়ে ত হয় না; আপনার হ'ল কেমন ক'রে, এরকম ত দেখি নি। কথাটা খুব ঠিক। বিশেষ করিয়া আমার দিন মনে ছিল, এইজন্য যে আমার জন্মদিন ও বিবাহের দিন একই হওয়াতে বিবাহের সময় ইহা লইয়া বেশ একটু গোলমাল হইয়াছিল। তারানাথ জ্যোতিষী নিশ্চয়ই তাহা জানে না, সে আমাকে কখনও দেখে নাই, আমার বন্ধু কিশোরী সেনও জানে না—তার সঙ্গে আলাপ মোটে দু-বছরের, তাও এক ব্রিজ খেলার আড্ডায়, সেখানে ঘনিষ্ঠ সাংসারিক কথা-বার্তার কোন অবকাশ ছিল না।

তারপর বৃদ্ধ বলিল—আপনার দুই ছেলে, এক মেয়ে। আপনার স্ত্রীর শরীর বর্তমানে বড় খারাপ যাচ্ছে। ছেলেবেলায় আপনি একবার গাছ থেকে প'ড়ে গিয়েছিলেন কিংবা জলে ডুবে গিয়েছিলেন—মোটের উপর আপনার মস্ত বড় ফাঁড়া গিয়েছিল, তের বছর বয়সে। কথা সবই ঠিক। লোকটার কিছু ক্ষমতা আছে দেখিতেছি। হঠাৎ তারানাথ বলিল, বর্তমানে আপনার বড় মানসিক কষ্ট যাচ্ছে, কিছু অর্থনষ্ট হয়েছে। সে

টাকা আর পাবেন না, বরং আরও কিছু ক্ষতিযোগ আছে। আমি আশ্চর্য হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিলাম। মাত্র দু-দিন আগে কলুটোলা স্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবার সময় পাঁচখানা নোটসুদ্ধ মনিব্যাগটি খোয়া গিয়াছে। লজ্জায় পড়িয়া কথাটা কাহাকেও প্রকাশ করি নাই। তারানাথ বোধ হয় থট্-রীডিং জানে। কিন্তু আরও ক্ষতি হইবে তাহা কেমন করিয়া বলিতেছে? এটুকু বোধ হয় ধাপ্পা। যাই হোক, সাধারণ হাত-দেখা গণকের মতো মন বুঝিয়া শুধু মিষ্টি মিষ্টি কথাই বলে না।

আমার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা সেদিন সে বলিয়াছিল। লোকটার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। মাঝে মাঝে তার ওখানে যাইতাম। হাত দেখাইতে যে যাইতাম তাহা নয়, প্রায়ই যাইতাম আড্ডা দিতে।

লোকটার বড় অদ্ভুত ইতিহাস। অল্প বয়স হইতে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে সে এক তান্ত্রিক গুরুর সাক্ষাৎ পায়। তান্ত্রিক খুব ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁর কাছে কিছুদিন তন্ত্রসাধনা করিবার ফলে তারানাথও কিছু ক্ষমতা পাইয়াছিল। তাহা লইয়া কলিকাতায় আসিয়া কারবার খুলিল এবং গুরুদত্ত ক্ষমতা ভাঙাইয়া খাইতে শুরু করিল।

শেয়ার মার্কেট, ঘোড়দৌড়, ফাট্‌কা ইত্যাদি ব্যাপারে সে তাহার ক্ষমতা দেখাইয়া শীঘ্রই এমন নাম করিয়া বসিল যে, বড় বড় মাড়োয়ারীর মোটর গাড়ির ভিড়ে শনিবার সকালে তার বাড়ির গলি আটকাইয়া থাকিত—পয়সা আসিতে শুরু করিল অজস্র। যে-পথে আসিল, সেই পথেই বাহির হইয়াও গেল। হাতে একটি পয়সাও দাঁড়াইল না।

তারানাথের জীবনে তিনটি নেশা ছিল প্রবল—ঘোড়দৌড়,

নারী ও সুরা। এই তিন দেবতাকে তুষ্ট রাখিতে কত বড় বড় ধনীর দুলাল যথাসর্বস্ব আহুতি দিয়া পথের ফকির সাজিয়াছে, তারানাথ ত সামান্য গণৎকার ব্রাহ্মণ মাত্র। প্রথম কয়েক বৎসরে তারানাথ যাহা পয়সা করিয়াছিল, পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহা কর্পূরের ন্যায় উবিয়া গেল, এদিকে ক্ষমতার অপব্যবহার করিতে করিতে ক্ষমতাটুকুও প্রায় গেল। ক্ষমতা যাইবার সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকার পসার নষ্ট হইল। তবুও ধূর্ততা, ফন্দিবাজি, ব্যবসাদারি প্রভৃতি মহৎ গুণরাজির কোনটিরই অভাব তারানাথের চরিত্রে না থাকাতে, সে এখনও খানিকটা পসার বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু বর্তমানে কাবুলী তাড়াইবার উপায় ও কৌশল বাহির করিতেই তারানাথের দিবসের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়, তন্ত্র বা জ্যোতিষ আলোচনার সময়ই বা কই ?

আমার মতো গুণমুগ্ধ ভক্ত তারানাথ পসার নষ্ট হওয়ার পরে যে পায় নাই, একথা খুবই ঠিক। আমাকে পাইয়া তাহার নিজের উপরে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। সুতরাং আমার উপর তারানাথের কেমন একটা বন্ধুত্ব জন্মিল।

সে আমায় প্রায়ই বলে তোমাকে সব শিখিয়ে দেব। তোমাকে শিষ্য ক'রে রেখে যাব, লোকে দেখবে তারানাথের ক্ষমতা কিছু আছে কি না। লোক পাই নি এতকাল যে তাকে কিছু দিই।

একদিন বলিল—চন্দ্রদর্শন করতে চাও? চন্দ্রদর্শন তোমায় শিখিয়ে দেব। দুই হাতের আঙুলে দুই চোখ বুজিয়ে চেপে রেখে দুই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে কান জোর করে চেপে চিত হয়ে শুয়ে থাক। কিছুদিন অভ্যেস করলেই চন্দ্রদর্শন হবে। চোখের সামনে পূর্ণচন্দ্র দেখতে পাবে। ওপরে আকাশে পূর্ণচন্দ্র আর

নিচে একটা গাছের তলায় ছুটি পরী। তুমি যা জানতে চাইবে, পরীরা তাই ব'লে দেবে। ভালো ক'রে চন্দ্রদর্শন যে অভ্যেস করেছে, তার অজানা কিছু থাকে না।

চন্দ্রদর্শন করি আর না করি, তারানাথের কাছে প্রায়ই যাইতাম। লোকটা এমন সব অদ্ভুত কথা বলে, যা পথে-ঘাটে বড় একটা শোনা ত যায়ই না, দৈনন্দিন খাটিয়া খাওয়ার জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্কও নাই। পৃথিবীতে যে আবার সে-সব ব্যাপার ঘটে, তাহা ত কোনদিন জানা ছিল না।

একদিন বর্ষার বিকাল বেলা তারানাথের ওখানে গিয়াছি। তারানাথ পুরাতন একখানা তুলোট কাগজের পুঁথির পাতা উল্টাইতেছে, আমাকে দেখিয়া বলিল—'চল বেলেঘাটাতে একজন বড় সাধু এসেছেন। দেখা করে আসি। খুব ভালো তান্ত্রিক শুনেছি।' তারানাথেব স্বভাবই ভালো সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধান করিয়া বেড়ানো—বিশেষ করিয়া সে সাধু যদি আবার তান্ত্রিক হয়, তবে তারানাথ সর্ব কর্ম ফেলিয়া তাহার পিছনে দিনরাত লাগিয়া থাকিবে।

গেলাম বেলেঘাটা। সাধুর ক্ষমতার মধ্যে দেখিলাম, তিনি আমাকে যে-কোন একটা গন্ধের নাম করিতে বলিলেন, আমি বেলফুলের নাম করিতেই তিনি বলিলেন—পকেটে রুমাল আছে? বার করে দেখ।

রুমাল বার করিয়া দেখি তাহাতে বেলফুলের গন্ধ ভুর-ভুর করিতেছে। আমি সাধুর নিকট হইতে পাঁচ-ছয় হাত দূরে বসিয়াছি এবং আমার পকেটে কেহ হাত দেয় নাই, ঘরে আমি, তারানাথ ও সাধু ছাড়া অন্য কেহই নাই, রুমালখানাতে আমার নামও লেখা—সুতরাং হাত-সাফাইয়ের সম্ভাবনা আদৌ নাই।

কিছু যে আশ্চর্য না হইলাম এমন নয়, কিন্তু যদি ধরিয়াই লই সাধুবাবাজী তান্ত্রিক-শক্তির সাহায্যেই আমার রুমালে গন্ধের সৃষ্টি করিয়াছেন, তবুও এত কষ্ট করিয়া তন্ত্রসাধনার ফল যদি দুই পয়সার আতর তৈরি করায় দাঁড়ায়, সে সাধনার আমি কোন মূল্য দিই না। আতর ত বাজারেও কিনিতে পাওয়া যায়।

ফিরিবার সময় তারানাথ বলিল—নাঃ, লোকটা নিম্নশ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেছে, তারই ফলে দু-একটা সামান্য শক্তি পেয়েছে।

তাই বা পায় কি করিয়া? বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম আতর প্রস্তুত করিতেও ত অনেক তোড়জোড়ের দরকার হয়, মুহূর্তের মধ্যে একজন লোক দূর হইতে আমার রুমালে যে বেলফুলের গন্ধ চালনা করিল—তাহার পিছনেও ত একটা প্রকাণ্ড বৈজ্ঞানিক অসম্ভাব্যতা রহিয়াছে, contact at a distance-এর মোটা সমস্যাটাই ওর মধ্যে জড়ানো। যদি ধরি হিপ্‌নটিজম্, সাধুর ইচ্ছাশক্তি আমার উপর ততক্ষণ কার্যকরী হইতে পারে, যতক্ষণ আমি তাহার নিকট আছি। তাহার সান্নিধ্য হইতে দূরেও আমার উপর যে হিপ্‌নটিজমের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, সে প্রভাবের মূলে কি আছে, সেও ত আর এক গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়।

তারানাথের সঙ্গে তাহার বাড়িতে গিয়া বসিলাম। তারানাথ বলিল—তুমি এই দেখেই দেখছি আশ্চর্য হয়ে পড়লে, তবুও ত সত্যিকার তান্ত্রিক দেখ নি। নিম্নশ্রেণীর তন্ত্র এক ধরনের যাদু, যাকে তোমরা বলো ব্ল্যাক্ ম্যাজিক। এক সময়ে আমিও ও-জিনিসের চর্চা যে না করেছি, তা নয়। ও আতরের গন্ধ আর এমন একটা কি, এমন সব ভয়ানক ভয়ানক তান্ত্রিক

দেখেছি, শুনলে পরে বিশ্বাস করবে না। একজনকে জানতুম সে বিষ খেয়ে হজম করত। কিছুদিন আগে কলকাতায় তোমরাও এ-ধরনের লোক দেখেছ। সালফিউরিক্ এসিড, নাইট্রিক এসিড খেয়েও বেঁচে গেল, জিভে একটু দাগও লাগল না। এসব নিম্ন ধরনের তন্ত্রচর্চার শক্তি, ব্ল্যাক্ ম্যাজিক ছাড়া কিছু নয়। এর চেয়েও অদ্ভুত শক্তির তান্ত্রিক দেখেছি।

কি হ'ল জান? ছেলেবেলায় আমাদের দেশে বাঁকুড়াতে এক নামকরা সাধু ছিলেন। আমার এক খুড়ীমা তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, আমাদের ছেলেবেলায় আমাদের বাড়ি প্রায়ই আসতেন। তিনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন, আমাদের বাড়ি এলেই আমাদের নিয়ে গল্প করতে বসতেন, আর আমাদের প্রায়ই বলতেন—দুই চোখের মাঝখানে ভুরুতে একটা জ্যোতি আছে, ভালো ক'রে চেয়ে দেখিস্, দেখতে পাবি। খুব একমনে চেয়ে দেখিস্। মাস দুই-তিন পরে আমার একদিন জ্যোতি দর্শন হ'ল। মনে ভাবলাম—চন্দ্রদর্শনের মতো নাকি? মুখে জিজ্ঞাসা করলাম কি ধরনের জ্যোতি?

—ঠিক নীল বিদ্যুৎশিখার মতো। প্রথম একদিন দেখলাম সন্ধ্যার কিছু আগে—বাড়ির পিছনে পেয়ারাতলায় ব'সে সাধুর কথামত নাকের উপর দিকে ঘণ্টাখানেক চেয়ে থাকতাম,—সব দিন ঘটে উঠ্‌ত না, হপ্তার মধ্যে দু-তিন দিন বসতাম। মাস-তিনেক পরে প্রথম জ্যোতি দর্শন হ'ল নীল, লিকলিকে একটা শিখা, আমার কপালের মাঝখানে ঠিক সামনে খুব স্থির, মিনিট-খানেক ছিল প্রথম দিন।

এই ভাবে ছেলেবেলাতেই সাধু-সন্ন্যাসী ও যোগ ইত্যাদি ব্যাপারে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। বাড়িতে আর মন টেকে না,

ঠাকুরমার বাক্স ভেঙে একদিন কিছু টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলাম একেবারে সোজা কাশীতে।

একদিন অহল্যা বাঈয়ের ঘাটে বসে আছি, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয় নি, মন্দিরে মন্দিরে আরতি চলছে, এমন সময় একজন লম্বা-চওড়া চেহারার সাধুকে খড়ম পায়ে দিয়ে কমণ্ডলু-হাতে ঘাটের পৈঠায় নামতে দেখলাম। তাঁর সারা দেহে এমন কিছু একটা ছিল, যা আমাকে আর অন্যদিকে চোখ ফেরাতে দিলে না, সাধু ত কতই দেখি। চুপ ক'রে আছি, সাধুবাবাজী জল ভ'রে পৈঠা বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে খাসা বাংলায় বললেন—বাবাজীর বাড়ি কোথায়?

আমি বললাম বাঁকুড়া জেলায়, মালিয়াড়া-রুদ্রপুর।

সাধু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন—মালিয়াড়া-রুদ্রপুর? তারপর কি যেন একটা ভাবলেন, খুব অল্পক্ষণ, একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। তারপর বললেন—রুদ্রপুরের রামরূপ সান্ন্যালের নাম শুনেছ? তাদের বংশে এখন কে আছে জান?

আমাদের গ্রামে সান্ন্যালেরা এক সময়ে খুব অবস্থাপন্ন ছিল, খুব বড় বাড়ি-ঘর, দরজায় হাতি বাঁধা থাকতো শুনেছি—কিন্তু এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু রামরূপ সান্ন্যালের নাম ত কখনও শুনি নি। সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে সে কথা বলতে, তিনি হেসে বললেন—তোমার বয়েস আর কতটুকু। তুমি জানবে কি ক'রে। খেয়াঘাটের কাছে শিবমন্দিরটা আছে ত?

খেয়াঘাট! রুদ্রপুরে নদীই নেই, মজে গিয়েছে কোন্‌কালে, এখন তার ওপর দিয়ে মানুষ-গরু হেঁটে চলে যায়। তবে পুরোনো নদীর খাতের ধারে একটা বহু প্রাচীন জীর্ণ শিবমন্দির জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে আছে বটে। শুনেছি সান্ন্যালদেরই কোন

পূর্বপুরুষ ঐ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এসব কথা ইনি কি ক'রে জানলেন?

বিস্ময়ের সুরে বললাম—আপনি আমাদের গাঁয়ের কথা অনেক জানেন দেখছি?

সন্ন্যাসী মৃদু হাসলেন, এমন হাসি শুধু স্নেহময় বৃদ্ধপিতামহের মুখে দেখা যায়, তার অতি তরুণ, অবোধ পৌত্রের কোন ছেলে-মানুষি কথার জন্য। সত্যি বল্‌ছি, সে হাসির স্মৃতি আমি এখনও ভুলতে পারি নি, খুব উঁচু না হ'লে অমন হাসি মানুষে হাসতে পারে না। তারপর খুব শান্ত, সস্নেহ কৌতুকের সুরে বললেন—বাড়ি থেকে বেরিয়েছিস্ কেন? ধর্মকর্ম করবি বলে?

আমি কিছু উত্তর দেবার আগেই তিনি আবার বল্‌লেন—বাড়ি ফিরে যা, সংসারধর্ম করগে যা। এপথ তোর নয়, আমার কথা শোন্।

বললাম—এমন নিষ্ঠুর কথা বলবেন না, কিছু হবে না কেন? আমার সংসারে মন নেই। সংসার ছেড়েই এসেছি।

তিনি হেসে বললেন—ওর নাম সংসার ছাড়া নয়। সংসার তুই ছাড়িস্ নি, ছাড়তে পারবিও নি। তুই ছেলেমানুষ, নির্বোধ। কিছু বোঝবার বয়েস হয় নি। যা বাড়ি যা। মা-বাপের মনে কষ্ট দিস্ নে।

কথা শেষ ক'রে তিনি চলে যাচ্ছেন দেখে আমি বল্‌লুম—কিন্তু আমাদের গাঁয়ের কথা কি ক'রে জানলেন বলবেন না? দয়া ক'রে বলুন—

তিনি কোন কথার উত্তর না দিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে চলতে লাগলেন—আমিও নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিলাম।

খানিক দূর গিয়ে তিনি আমাকে দাঁড়িয়ে বললেন—কেন আসছিস্ ?

—আপনাকে ছাড়ব না। আমি কিছু চাই নে, আপনার সঙ্গ চাই।

তিনি সস্নেহে বললেন—আমার সঙ্গে এলে তোর কোন লাভ হবে না। তোকে সংসার করতেই হবে। তোর সাধ্য নেই অন্য পথে যাবার। যা চলে যা—তোকে আশীর্বাদ করছি সংসারে তোর উন্নতি হবে।

আর সাহস করলুম না তাঁর অনুসরণ করতে, কি-একটা শক্তি আমার ইচ্ছাসত্ত্বেও যেন তাঁর পিছনে পিছনে যেতে আমায় বাধা দিলে। দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পরে সামনের দিকে চেয়ে দেখি তিনি নেই। বুঝতে পারলুম না কোন্ গলির মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছেন বা কোন্‌দিকে গেলেন।

প্রসঙ্গক্রমে ব'লে নিই, অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে এসে দেশের খুব বৃদ্ধ লোকদের কাছে খোঁজ নিয়েও রামরূপ সান্ন্যালের কোন হদিস মেলাতে পারলাম না। সান্ন্যালদের বাড়ির ছেলে-ছোকরার দল ত কিছুই বলতে পারে না। ওদের এক শরিক জলপাইগুড়িতে ডাকঘরে কাজ করতেন, তিনি পেন্সন নিয়ে সেবার শীতকালে বাড়ি এলেন। কথায় কথায় তাঁকে একদিন প্রশ্নটা করাতে তিনি বলিলেন—দেখ, আমার ছেলেবেলায় বড় জ্যাঠামশায়ের কাছে একখানা খাতা দেখেছি, তাতে আমাদের বংশের অনেক কথা লেখা ছিল। বড় জ্যাঠামশায়ের ঐ সব শখ ছিল, অনেক কষ্ট ক'রে নানা জায়গায় হাঁটাহাঁটি ক'রে বংশের কুলজী যোগাড় করতেন। তাঁর মুখে শুনেছি চার-পাঁচ পুরুষ আগে আমাদেরই বংশে রামরূপ সান্ন্যাল নদীর

ধারে ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রামরূপ সাধক-পুরুষ ছিলেন, বিবাহ করেছিলেন, ছেলেমেয়েও হয়েছিল—কিন্তু সংসারে তিনি বড় একটা লিপ্ত ছিলেন না। রামরূপের বড় ভাই ছিলেন রামনিধি, প্রথম যৌবনেই অবিবাহিত অবস্থায় তিনি সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেন, আর কখনও দেশে ফেরেন নি। অন্ততঃ দেড়-শ বছর আগের কথা হবে।

জিজ্ঞাসা করলুম—ঐ শিবমন্দিরটা ও-রকম মাঠের মধ্যে বেখাপ্পা জায়গায় কেন?

—তা নয়। ওখানে তখন বহতা নদী ছিল। খুব স্রোত ছিল। বড় বড় কিস্তি চলত। কোন্ নৌকা একবার ওই মন্দিরেব নিচের ঘাটে মারা পড়ে ব'লে ওর নাম লা-ভাঙার খেয়াঘাট।

প্রায় চিৎকার করে বলে উঠলুম, খেয়াঘাট?

তিনি অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন—হ্যাঁ, জ্যাঠামশায়ের মুখে শুনেছি, বাবার মুখে শুনেছি, তা ছাড়া আমাদের পুরোনো কাগজপত্রে আছে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লা-ভাঙার খেয়াঘাটের ওপর। কেন বল ত, এসব কথা তোমার জানবার কি দরকার হ'ল? বই-টই লিখছ না কি?

ওদের কাছে কোন কথা বলি নি, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এবং সে বিশ্বাস আজও আছে যে, কাশীর সেই সন্ন্যাসী রামরূপের দাদা রামনিধি নিজেই। কোন অদ্ভুত যৌগিক শক্তির বলে দেড়-শ বছর পরেও বেঁচে আছেন।

বাড়ি থেকে কিছুদিন পরে আবার সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে বেরই। বীরভূমের এক গ্রামে শুনলাম সেখানকার শ্মশানে

এক পাগলী থাকে, সে আসলে খুব বড় তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী। পাগলীর সঙ্গে দেখা করলাম, নদীর ধারে শ্মশানে। ছেঁড়া একটা কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেমন ময়লা কাপড়চোপড় পরনে, তেমনই মলিন জটপাকানো চুল। আমাকে দেখেই সে গেল মহা চটে। বললে—বেরো এখান থেকে, কে বলেছে তোকে এখানে আসতে ?

ওর আলুথালু বিকট মলিন চেহারা দেখে মনে যে ভাব এসেছিল, সেটাকে অতি কষ্টে চেপে বললাম—মা, আমাকে আপনার শিষ্য ক'রে নিন্, অনেক দূর থেকে এসেছি, দয়া করুন আমার ওপর। পাগলী চেঁচিয়ে উঠে বললে—পালা এখান থেকে। বিপদে পড়বি—

আঙ্গুল দিয়ে গ্রামের দিকে দেখিয়ে বললে—যা—

নির্জন শ্মশান, ভয় হ'ল ওর মূর্তি দেখে, কি জানি মারবে-টারবে নাকি—পাগল মানুষকে বিশ্বাস নেই। সেদিন চলে এলাম, কিন্তু আবার গেলাম তার পরদিন।

পাগলী বললে—আবার কেন এলি ?

বললাম—মা, আমাকে দয়া কর—

পাগলী বললে—দূর হ—দূর হ, বেরো এখান থেকে—

তারপর রেগে আমায় মারলে এক লাথি। বললে—ফের যদি আসিস্, তবে বিপদে পড়বি, খুব সাবধান।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, না, এখান থেকে চলে যাই, আর এখানে নয়। কি এক পাগলের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যাবে দেখছি কোন্‌দিন।

শেষ রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম পাগলী এসে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে, সে চেহারা আর নেই, মৃদু হাসি-হাসি মুখ, আমায়

যেন বললে—লাথিটা খুব লেগেছে না রে? তা রাগ করিস্ নে, কাল যাস্ আমার ওখানে। সকালে উঠেই আবার গেলাম। ও মা, স্বপ্ন-টপ্ন সব মিথ্যে, পাগলী আমায় দেখে মারমূর্ত্তি হ'য়ে শশ্মানের একখানা পোড়া-কাঠ আমার দিকে ছুঁড়ে মারলে। আমিও তখন মরিয়া হয়েছি, বললাম—তুমি তবে রাত্রে আমায় বলতে গিয়েছিলে কেন স্বপ্নে? তুমিই ত আসতে বললে তাই এলাম।

পাগলী খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। তোকে বলতে গিয়েছিলাম স্বপ্নে। তোর মুণ্ডু চিবিয়ে খেতে গিয়েছিলাম। হি—হি—হি—যা বেরো—

কেন জানি না, এই পাগলী আমাকে অদ্ভুত ভাবে আকৃষ্ট করেছে, আমি বুঝলাম তখনি সেখানে দাঁড়িয়ে। এ যতই আমাকে বাইরে তাড়িয়ে দেবার ভান করুক, আমার মনে হ'ল ভেতরে ভেতরে এ আমায় এক অজ্ঞাত শক্তির ব'লে টানছে।

হঠাৎ সে বললে—বোস্ এখানে।

আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দিলে, তার আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেবার ভঙ্গিটা যেন খুব রাজা-জমিদারের ঘরের কর্ত্রীর মতো—তার সে হুকুম পালন না ক'রে যে উপায় নেই।

কাজেই বসতে হ'ল।

সে বললে—কেন এখানে এসে এসে বিরক্ত করিস্, বল্ ত? তোর দ্বারা কি হবে, কিছু হবে না। তোর সংসারে এখনও পুরো ভোগ রয়েছে। আমি চুপ করেই থাকি। খানিকটা বাদে পাগলী বললে—আচ্ছা কিছু খাবি? আমার এখানে যখন এসেছিস্, তার ওপর আবার বামুন, তখন কিছু খাওয়ান দরকার। বল কি খাবি?

পাগলীর শক্তি কত দূর দেখবার জন্য বড় কৌতূহল হ'ল। এর আগে লোকের মুখে শুনে এসেছি, যা চাওয়া যায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এনে দিতে পারে। কলকাতায় গন্ধ-বাবাজীর কাছে খানিকটা যদিও দেখেছি, সে আমার ততটা আশ্চর্য ব'লে মনে হয় নি। বললাম—খাব অমৃতি জিলিপি, ক্ষীরের বরফি আর মর্তমান কলা। পাগলী এক আশ্চর্য ব্যাপার করলে। শ্মশানের কতকগুলো পোড়াকয়লা পাশেই পড়েছিল, হাতে তুলে নিয়ে বললে—এই নে খা, ক্ষীরের বরফি—

আমি ত অবাক্! ইতস্ততঃ করছি দেখে সে পাগলের মতো খিলখিল করে কি এক রকম অসম্বদ্ধ হাসি হেসে বললে—খা—খা—ক্ষীরের বরফি খা—

আমার মনে হ'ল এ ত দেখছি পুরো পাগল, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, এর কথায় মড়া পোড়ানো কয়লা মুখে দেব—ছিঃ ছিঃ—কিন্তু আমার তখন আর ফেরবার পথ নেই, অনেক দূর এগিয়েছি। দিলাম সেই কয়লা মুখে পুরে, যা থাকে কপালে! পরক্ষণেই থু থু করে সেই বিশ্রী, বিস্বাদ চিতার কয়লার টুকরো মুখ থেকে বার ক'রে ফেলে দিলুম। পাগলী আবার খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

রাগে দুঃখে আমার চোখে তখন জল এসেছে। কি বোকামি করেছি এখানে এসে—এ পাগলই, পাগল ছাড়া আর কিছু নয়, বদ্ধ উন্মাদ, পাড়াগাঁয়ের ভূতেরা সাধু বলে নাম রটিয়েচে।

পাগলী হাসি থামিয়ে বিদ্রূপের সুরে বল্‌লে—খেলি রাবড়ি, মর্তমান কলা? পেটুক কোথাকার। পেটের জন্যে এসেছ শ্মশানে আমার কাছে? দূর হ জানোয়ার—দূর হ। আমার ভয়ানক রাগ হ'ল। অমন নিষ্ঠুর কথা আমায় কখনও কেউ

মুখের ওপর বলে নি। একটিও কথা না ব'লে আমি তখনই সেখানে থেকে উঠে চলে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না, আবার সেদিন শেষ রাত্রে পাগলীকে স্বপ্নে দেখলাম, আমার শিয়রের দিকে দাঁড়িয়ে হাসি-হাসি মুখে বলছে—রাগ করিস্ নে। আসিস্ আজ, রাগ করে না, ছিঃ—

এখনও পর্যন্ত আমার সন্দেহ হয় পাগলীকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, না জাগ্রত অবস্থায় দেখেছিলাম।

যা হোক্, জেগে উঠে আমার রাগ আর রইল না। পাগলী আমায় যাদু করলে না কি?

গেলাম আবার দুপুরে। এবার কিন্তু তার মূর্তি ভারী প্রসন্ন! বললে—আবার এসেছিস্ দেখছি। আচ্ছা নাছোড়বান্দা ত তুই?

আমি বললাম—কেন বাঁদর নাচাচ্ছ আমায় নিয়ে? দিনে অপমান ক'রে বিদেয় ক'রে আবার রাত্রে গিয়ে আসতে বল। এ রকম হয়রান ক'রে তোমার লাভ কি?

পাগলী বললে—পারবি তুই? সাহস আছে? ঠিক যা বলব তা করবি? বললাম—আছে। যা বলবে তাই করব। দেখই না পরীক্ষা ক'রে। সে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলে। সে বললে—আজ রাত্রে আমায় তুই মেরে ফেল্। গলা টিপে মেরে ফেল্। তারপর আমার মৃতদেহের ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে। নিয়ম ব'লে দেব। বাজার থেকে মদ কিনে নিয়ে আয়। আর দুটো চাল-ছোলা ভাজা। মাঝে মাঝে আমার মৃতদেহ হাঁ ক'রে বিকট চিৎকার ক'রে উঠবে যখন, তখন আমার মুখে এক ঢোক মদ আর দুটো চালভাজা দিবি। ভোর-রাত পর্যন্ত এমনি মড়ার ওপর ব'সে মন্ত্রজপ করতে হবে।

রাত্রে হয়ত অনেক রকম ভয় পাবি। যারা এসে ভয় দেখাবে তারা কেউ মানুষ নয়। কিন্তু তাদের ভয় ক'রো না। ভয় পেলে সাধনা ত মিথ্যা হবেই, প্রাণ পর্যন্ত হারাতে পার। কেমন রাজী?

ও যে এমন কথা বলবে তা বুঝতে পারি নি। কথা শুনে তো অবাক্ হ'য়ে গেলাম। বললাম, সব পারব কিন্তু মানুষ খুন করা আমায় দিয়ে হবে না। আর তুমিই বা আমার জন্যে মরবে কেন?

পাগলী রেগে বললে—তবে এখানে মরতে এসেছিলি কেন মুখপোড়া, বেরো, দূর হ—

আরও নানা রকম অশ্লীল গালাগাল দিলে। ওর মুখে কিছু বাধে না, মুখ বড় খারাপ। আমি আজকাল ওগুলো আর তত গায়ে মাখি নে, গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। বললাম—রাগ করছ কেন? একটা মানুষকে খুন করা কি মুখের কথা? আমি না ভদ্রলোকের ছেলে?

পাগলী আবার মুখ বিকৃত ক'রে বললে—ভদ্দর লোকের ছেলে। ভদ্দর লোকের ছেলে তবে এ পথে এসেছিস্ কেন রে, ও অলপ্পেয়ে ঘাটের মড়া? তন্ত্র-মন্ত্রের সাধনা ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ নয়—যা গিয়ে কামিজ চাদর প'রে হৌসে চাকরি কর্ গিয়ে—বেরো—

বললাম তুমি শুধু রাগই কর। পুলিসের হাঙ্গামার কথাটা ত ভাবছ না। আমি যখন ফাঁসি যাব, তখন ঠেকাবে কে?

মনে মনে আবার সন্দেহ হ'ল, না এ নিতান্তই পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। এর কাছে এসে শুধু এতদিন সময় নষ্ট করেছি ছাড়া আর কিছু না।

তখনই মনে পড়ল পাগলীর মুখে শুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক শুনেছি, তন্ত্রের কথা শুনেছি। সময়ে সময়ে সত্যই এমন কথা বলে যে, ওকে বিদুষী ব'লে সন্দেহ হয়।

সেইদিন থেকে পাগলী আমার ওপর প্রসন্ন হ'ল। বিকেলে যখন গেলাম, তখন আপনিই ডেকে বললে—আমার রাগ হ'লে আর জ্ঞান থাকে না, তোকে ওবেলা গালাগাল দিয়েছি, কিছু মনে করিস্ নে। ভালোই হয়েছে, তুই সাধনা করতে চাস্ নি। ও সব নিম্ন-তন্ত্রের সাধনা। ওতে মানুষের কতক-গুলো শক্তি লাভ হয়। তা ছাড়া আর কিছু হয় না।

বললাম—কি ভাবে শক্তি লাভ হয়? পাগলী বললে—পৃথিবীতে নানা রকম জীব আছে তাদের চোখে দেখতে পাওয়া যায় না। মানুষ ম'রে দেহশূন্য হ'লে চোখে দেখা যায় না, আমরা তাদের বলি ভূত। এ ছাড়া আরও অনেক রকম প্রাণী আছে, তাদের বুদ্ধি মানুষের চেয়ে কম, কিন্তু শক্তি বেশি। এদেরও দেখা যায় না। তন্ত্রে এদের ডাকিনী, শাঁখিনী এই সব নাম। এরা কখনও মানুষ ছিল না, মানুষ ম'রে যেখানে যায়, এরা সেখানকার প্রাণী। মুসলমান ফকিরেরা এদের জিন্ বলে। এদের মধ্যে ভালো-মন্দ দুই-ই আছে। তন্ত্রসাধনার বলে এদের বশ করা যায়। তখন যা বলা যায় এরা তাই করে। করতেই হবে, না ক'রে উপায় নেই। কিন্তু এদের নিয়ে খেলা করার বিপদ আছে। অসাবধান তুমি যদি হয়েছ, তোমাকে মেরে ফেলতে পারে।

অবাক্ হয়ে ওর কথা শুনছিলাম। এসব কথা আর কখনও শুনি নি। এর মতো পাগলের মুখেই এ-কথা সাজে। আর যেখানে বসে শুনছি, তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাও এই কথার,

উপযুক্ত বটে। গ্রাম্য শ্মশান, একটা বড় তেঁতুলগাছ আর এক দিকে কতকগুলো শিমুল গাছ। দু-চার দিন আগের একটা চিতার কাঠকয়লা আর একটা কলসী জলের ধারে পড়ে রয়েছে। কোনদিকে লোকজন নেই। অজ্ঞাতসারে আমার গা যেন শিউরে উঠল।

পাগলী তখনও ব'লে যাচ্ছে। অনেক সব কথা, অদ্ভুত ধরনের কথা।

—এক ধরনের অপদেবতা আছে, তন্ত্রে তাদের বলে হাঁকিনী। তারা অতি ভয়ানক জীব। বুদ্ধি মানুষের চেয়ে অনেক কম, দয়া মায়া ব'লে পদার্থ নেই তাদের। পশুর মতো মন। কিন্তু তাদের ক্ষমতা সব চেয়ে বেশি। এরা যেন প্রেতলোকের বাঘ-ভালুক। ওদের দিয়ে কাজ বেশি হয় ব'লে যাদের বেশি দুঃসাহস, এমন তান্ত্রিকেরা হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ হবার সাধনা করে। হ'লে খুবই ভালো, কিন্তু বিপদের ভয়ও পদে পদে। তাদের নিয়ে যখন তখন খেলা করতে নেই, তাই তোকে বারণ করি। তুই বুঝিস্ নে, তাই রাগ করিস্।

কৌতূহল আর সংবরণ করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলাম—তুমি তাহ'লে হাঁকিনীমন্ত্রে সিদ্ধ, না? ঠিক বল।

পাগলী চুপ করে রইল।

আমি তাকে আর প্রশ্ন করলাম না, বুঝলাম পাগলী এ-কথা কিছুতেই বলবে না। কিন্তু এ-বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ রইল না।

পরদিন গ্রামের লোকে আমাকে পাগলীর সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। বললে—আপনি ওখানে যাবেন না অত ঘন ঘন। পাগলী ভয়ানক মানুষ, ওর মধ্যে এমন শক্তি আছে,

আপনার একেবারে সর্বনাশ ক'রে দিতে পারে। ওকে বেশি ঘাঁটাবেন না মশায়। গাঁয়ের কোন লোক ওর কাছেও ঘেঁষে না। বিদেশী লোক মারা পড়বেন শেষে?

মনে ভাবলাম, কি আমার করবে, যা করবার তা করেছে। তার কাছে না গিয়ে থাকবার শক্তি আমার নেই।

তার পরে একদিন যা হ'ল, তা বিশ্বাস করবেন না। একদিন সন্ধ্যের পরে পাগলীর কাছে গিয়েছি, কিন্তু এমন ভাবে গিয়েছি পাগলী না টের পায়। পাগলীর সেই বটতলায় গিয়ে হঠাৎ অবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বটতলায় পাগলী বসে নেই, তার বদলে একটি ষোড়শী বালিকা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সামনের দিকে চেয়ে রয়েছে। চোখের ভুল নয় মশায়, আমার তখন কাঁচা বয়েস, চোখে ঝাপসা দেখবার কথা নয়, স্পষ্ট দেখলাম।

ভাবলাম, তাই ত! এ আবাব কে এল? যাই কি না যাই?

দু-এক পা এগিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, মা, তিনি কোথায় গেলেন?

মেয়েটি হেসে বললে, কে?

—সেই তিনি, এখানে থাকতেন।

মেয়েটি খিলখিল ক'রে হেসে বললে—আ মরণ, কে তার নামটাই বল্ না—নাম বলতে লজ্জা হচ্ছে নাকি?

আমি চমকে উঠলাম। সেই পাগলীই ত! সেই হাসি, সেই কথা বলবার ভঙ্গি। এই ষোড়শী বালিকার মধ্যে সেই পাগলী রয়েছে লুকিয়ে! সে এক অদ্ভুত আকৃতি, ভেতরে সেই পরিচিতা পাগলী, বাহিরে এক অপরিচিতা রূপসী ষোড়শী বালিকা।

মেয়েটি হেসে চ'লে পড়ে আর কি। বললে—এস না, ব'স না এসে পাশে—লজ্জা কি? আহা, আর অত লজ্জায় দরকার নেই। এস—

হঠাৎ আমার বড় ভয় হ'ল। মেয়েটির রকম-সকম আমার ভালো ব'লে মনে হ'ল না—তা ছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল এ পাগলীই, আমায় কোন বিপদে ফেলবার চেষ্টায় আছে।

ফিরে চলে যাচ্ছি, এমন সময়ে পরিচিত কণ্ঠের ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম, দেখি, বটতলায় পাগলী বসে আছে—আর কেউ কোথাও নেই।

আমার তখনও ভয় যায় নি। ভাবলাম, আজ আর কিছুতেই এখানে থাকব না, আজ ফিরে যাই।

পাগলী বললে—এস, ব'স।

বললাম—তুমি ও-রকম ছোট মেয়ে সেজেছিলে কেন? তোমার মতলবখানা কি?

পাগলী বললে—আ মরণ, ঘাটের মড়া, আবোল-তাবোল বকছে।

বললাম—না, সত্যি কথা বলছি, আমায় কোন ভয় দেখিও না। যখন তোমায় মা ব'লে ডেকেছি।

পাগলী বললে—শোন্ তবে। তুই সে-রকম নস্। তন্ত্রের সাধনা তোকে দিয়ে হবে না, অত সাধু সেজে থাকবার কাজ নয়। থাক, তোকে দু-একটা কিছু দেব, তাতেই তুই ক'রে খেতে পারবি। একটা মড়া চাই। আসবে শিগ্‌গির অনেক মড়া, এই ঘাটেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা কর্। কিন্তু যা ব'লে দেব, তাই করবি। রাজী আছিস্? শবসাধনা ভিন্ন কিছু হবে না।

তখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। আমি ভীতু লোকে ছিলাম না কোন কালেই, তবুও কখনও মড়ার উপরে ব'সে সাধনা করব এ-কল্পনাও করি নি। কিন্তু রাজী হ'লাম পাগলীর প্রস্তাবে। বললাম—বেশ, তুমি যা বলবে তাই করব। কিন্তু পুলিসের হাঙ্গামার মধ্যে যেন না পড়ি। আর সব তাতে রাজী আছি।

একদিন সন্ধ্যের কিছু আগে গিয়েছি। সেদিন দেখলাম পাগলীর ভাবটা যেন কেমন কেমন। ও আমায় বললে—একটা মড়া পাওয়া গিয়েছে, চুপি চুপি এস।

জলের ধারে বড় একটা পাকুড় গাছের শেকড় জলের মধ্যে অনেকখানি নেমে গিয়েছে। সেই জড়ানো পাকানো জলমগ্ন শেকড়ের মধ্যে একটা ষোল-সতের বছরের মেয়ের মড়া বেধে আছে। কোন ঘাট থেকে ভেসে এসেছে বোধ হয়।

ও বললে, তোল্ মড়াটা—শেকড় বেয়ে নেমে যা। জলের মধ্যে মড়া হালকা হবে। ওকে তুলে শেকড়ে রেখে দে। ভেসে না যায়।

তখন কি করছি জ্ঞান ছিল না। মড়ার পরনে তখনও কাপড়, সেই কাপড় জড়িয়ে গিয়েছে শেকড়ের মধ্যে। আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হ'ল না, অল্প চেষ্টাতেই সেটা টেনে তুলে ফেললাম।

পাগলী বললে—মড়ার ওপর ব'সে তোকে সাধনা করতে হবে—ভয় পাবি নে ত? ভয় পেয়েছ কি মরেছ।

আমি হঠাৎ আশ্চর্য হয়ে চিৎকার ক'রে উঠলাম। মড়ার মুখ তখন আমার নজরে পড়েছে। সেদিনকার সেই ষোড়শী বালিকা। অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, কোন তফাত নেই।

পাগলী বললে—চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন, ও আপদ ?

আমার মাথার মধ্যে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে তখন। পাগলীকে দেখে তখন আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল। মনে ভাবলাম, এ অতি ভয়ানক লোক দেখছি। গাঁয়ের লোকে ঠিকই বলে।

কিন্তু ফিরবার পথ তখন আমার বন্ধ। পাগলী আমায় যা যা করতে বললে, সন্ধ্যে থেকে আমাকে তা করতে হ'ল।

শবসাধনার অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সব কথা তোমায় বলবারও নয়। সন্ধ্যের পর থেকেই আমি শবের ওপর আসন ক'রে বসলাম। পাগলী একটা অর্থশূন্য মন্ত্র আমাকে বললে—সেটাই জপ করতে হবে অনবরত। আমার বিশ্বাস হয় নি যে, এতে কিছু হয়। এমন কি, ও যখন বললে—যদি কোন বিভীষিকা দেখ, তবে ভয় পেয়ো না। ভয় পেলেই মরবে।—তখন আমার মনে বিশ্বাস হয় নি।

রাত্রি দুপুর হ'ল ক্রমে। নির্জন শ্মশান, কেউ কোন দিকে নেই, নীরন্ধ্র অন্ধকারে দিগবিদিক্ লুকিয়েছে। পাগলী যে কোথায় গেল, তাও আমি আর দেখি নি।

হঠাৎ এক পাল শেয়াল ডেকে উঠল নদীর ধারে একটা কষাড় ঝোপের আড়ালে। শেয়ালের ডাক ত কতই শুনি, কিন্তু সেই ভয়ানক শ্মশানে একা টাটকা মড়ার ওপর ব'সে সেই শেয়ালের ডাকে আমার সর্বাঙ্গ শিউরে উঠল।

ঠিক সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ব্যাপার ঘটল। বিশ্বাস করা-না-করা তোমার ইচ্ছে—কিন্তু তোমার কাছে মিথ্যে ব'লে আমার কোন স্বার্থ নেই। আমি তারানাথ জ্যোতিষী, বুঝি কেবল পয়সা—তুমি আমাকে এক পয়সা দেবে না। সুতরাং তোমার কাছে মিথ্যে বলতে যাব কেন ?

শেয়াল ডাকার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হ'ল শ্মশানের নিচে নদীজল থেকে দলে-দলে সব বৌ-মানুষরা উঠে আসছে—অল্পবয়সী বৌ, মুখে ঘোমটা টানা, জল থেকে উঠে এল অথচ কাপড় ভিজে নয় কারো। দলে দলে—একটা, ছুটো, পাঁচটা, দশটা, বিশটা।

তারা সকলে এসে আমায় ঘিরে দাঁড়াল—আমি একমনে মন্ত্র জপ করছি। ভাবছি—যা হয় হবে।

একটু পরে ভালো ক'রে চাইতে গিয়ে দেখি, আমার চার পাশে একটাও বৌ নয়, সব কর্‌রা পাখি, বীরভূমে নদীর চরে যথেষ্ট হয়। ছু-পায়ে গম্ভীর ভাবে হাঁটে ঠিক যেন মানুষের মতো।

এক মুহূর্তে মনটা হালকা হয়ে গেল—তাই • বল! হরি হরি! পাখি!

চিন্তাটা আমার সম্পূর্ণ শেষও হয়নি—পরক্ষণেই আমার চার পাশে মেয়ে-গলায় কারা খলখল ক'রে হেসে উঠল।

হাসির শব্দে আমার গায়ের রক্ত আরও হিম হয়ে জমে গেল যেন। চেয়ে দেখি তখন একটাও পাখি নয়, সবই অল্পবয়সী বৌ। তারা তখন সবাই একযোগে ঘোমটা খুলে আমার দিকে চেয়ে আছে।...আর তাদের চারদিকে, সেই বড় মাঠের যেদিকে তাকাই, অসংখ্য নরকঙ্কাল দূরে, নিকটে, ডাইনে, বাঁয়ে, অন্ধকারের মধ্যে সাদা সাদা দাঁড়িয়ে আছে। কত কালের পুরোনো জীর্ণ হাড়ের কঙ্কাল, তাদের অনেকগুলোর হাতের সব আঙুল নেই, অনেকগুলোর হাড় রোদে জলে চটা উঠে ক্ষয়ে গিয়েছে, কোনটার মাথার খুলি ফুটো, কোনটার পায়ের নলির হাড় ভেঙে বেঁকে আছে। তাদের মুখও নানাদিকে

ফেরানো—দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে মনে হয়, কেউ যেন তাদের বহু যত্নে তুলে ধ'রে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। কঙ্কালের আড়ালে পেছন থেকে যে লোকটা এদের খাড়া ক'রে রেখেছে, সে যেই ছেড়ে দেবে, অমনি কঙ্কালগুলো হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়ে গিয়ে জীর্ণ ভাঙাচোরা তোবড়ানো, নোনা-ধরা হাড়ের রাশি স্তূপাকার হয়ে উঠবে। অথচ তারা যেন সবাই সজীব, সকলেই আমাকে পাহারা দিচ্ছে, আমি যেন প্রাণ নিয়ে এ-শ্মশান থেকে পালাতে না পারি। হাড়ের হাত বাড়িয়ে একযোগে সবাই যেন আমার গলা টিপে মারবার অপেক্ষায় আছে।

উঠে সোজা দৌড় দেব ভাবছি, এমন সময় দেখি আমার সামনে এক অতি রূপসী বালিকা আমার পথ আগলে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। এ আবার কে? যা হোক্, সব রকম ব্যাপারের জন্যে আজ প্রস্তুত না হয়ে আর শবসাধনা করতে নামি নি। আমি কিছু বলবার আগে মেয়েটি হেসে হেসে বললে—আমি ষোড়শী, মহাবিদ্যাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আমায় তোমার পছন্দ হয় না?

মহাবিদ্যা-টহাবিদ্যার নাম শুনেছিলাম বটে পাগলীর কাছে, কিন্তু তাঁদের ত শুনেছি অনেক সাধনা ক'রেও দেখা মেলে না, আর এত সহজে ইনি...বললাম—আমার মহাসৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন...আমার জীবন ধন্য হ'ল...

মেয়েটি বললে—তবে তুমি মহাডামরী সাধনা করছ কেন?

—আজ্ঞে, আমি ত জানি নে কোন্ সাধনা কি রকম। পাগলী আমায় যেমন ব'লে দিয়েছে, তেমনি করছি।

—বেশ, মহাডামরী সাধনা তুমি ছাড়। ও মন্ত্র জপ ক'রো না। যখন দেখা দিয়েছি, তখন তোমার আর কিছুতে দরকার

নেই। তুমি মহাডামরী ভৈরবীকে দেখ নি—অতি বিকট তার চেহারা···তুমি ভয় পাবে। ছেড়ে দাও ও মন্ত্র।

সাহসে ভর ক'রে বললাম—সাধনা ক'রে আপনাদের আনতে হয় শুনেছি, আপনি এত সহজে আমাকে দেখা দিলেন কেন?

—তোমার সন্দেহ হচ্ছে?

আমার মনে হ'ল এই মুখ আমি আগে কোথাও দেখেছি, কিন্তু তখন আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছে, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। বললাম—সন্দেহ নয়, কিন্তু বড় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। আমি কিছুই জানি নে কে আপনারা।···যদি অপরাধ করি মাপ করুন, কিন্তু কথাটার জবাব যদি পাই—

বালিকা বললে—মহাডামবীকে চেন না? আমাকেও চেন না? তা হ'লে আব চিনে কাজ নেই। এসেছি কেন জিজ্ঞেস করছ? দিব্যৌঘ পথের নাম শুননি তন্ত্রে? পাষণ্ডদলনের জন্যে ঐ পথে আমবা পৃথিবীতে নেমে আসি। তোমার মন্ত্রে দিব্যৌঘ পথে সাড়া জেগেছে। তাই ছুটে দেখতে এলাম।

কথাটা ভালো বুঝতে পারলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম, তবে আমি কি খুবই পাষণ্ড?

বালিকা খিলখিল করে হেসে উঠল।

বললে—তোমার বেলা এসেছি সম্প্রদায় রক্ষার জন্যে···অত ভয় কিসের! আমি না তোকে লাথি মেবেছি? শ্মশানের পোড়া কাঠ ছুঁড়ে মেরেছি। তোকে পরীক্ষা না ক'রে কি সাধনার নিয়ম ব'লে দিয়েছি তোকে?

আমি ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি, বলে কি?

মেয়েটি আবার বললে—কিন্তু মহাডামরীর বড় ভীষণ রূপ, তোর যেমন ভয়, সে তুই পারবি নে—ও ছেড়ে দে—

—আপনি যখন বললেন তাই দিলাম।

ঠিক কথা দিলি?

—দিলাম। এ সময়ে যে-শবদেহের উপর বসে আছি, তার দিকে আমার নজর পড়ল। পড়তেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আমার সর্বশরীর কেমন হয়ে গেল।

শবদেহের সঙ্গে সম্মুখের ষোড়শী রূপসীর চেহারার কোন তফাত নেই। একই মুখ, একই রং, একই বয়েস।

বালিকা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে—চেয়ে দেখছিস্ কি?

আমি কথার কোন উত্তর দিলাম না। কিছুক্ষণ থেকে একটা সন্দেহ আমার মনে ঘনিয়ে এসেছিল, সেটা মুখেই প্রকাশ ক'রে বললাম—কে আপনি? আপনি কি সেই শ্মশানের পাগলীও না কি?

একটা বিকট বিদ্রূপের হাসিতে রাত্রির অন্ধকার চিরে ফেড়ে চৌচির হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মাঠময় নরকঙ্কালগুলো হাড়ের হাতে তালি দিতে দিতে এঁকে বেঁকে উদ্দাম নৃত্য শুরু করলে। আর অমনি সেগুলো নাচের বেগে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল। কোন কঙ্কালের হাত খসে গেল, কোনটার মেরুদণ্ড, কোনটার কপালের হাড়, কোনটার বুকের পাঁজরাগুলো—তবুও তাদের নৃত্য সমানেই চলছে—এদিকে হাড়ের রাশি উঁচু হয়ে উঠল, আর হাড়ে হাড়ে লেগে কি বীভৎস ঠক্ ঠক্ শব্দ!

হঠাৎ আকাশের এক প্রান্ত যেন জড়িয়ে গুটিয়ে গেল কাগজের মতো, আর সেই ছিদ্রপথে যেন এক বিকটমূর্তি নারী উন্মাদিনীর মতো আলুথালু বেশে নেমে আসছে দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে চার পাশের বনে শেয়ালের দল আবার ডেকে উঠল,

বিশ্রী মড়া পচার দুর্গন্ধে চারদিক পূর্ণ হ'ল, পেছনের আকাশটা আগুনের মতো রাঙা-মেঘে ছেয়ে গেল, তার নিচে চিল, শকুনি উড়ছে সেই গভীর রাত্রে! শেয়ালের চিৎকার ও নরকঙ্কালের ঠোকাঠুকি শব্দ ছাড়া সেই ভয়ানক রাতে বাকি সব জগৎ নিস্তব্ধ, সৃষ্টি নিঝুম!

আমার গা শিউরে উঠল আতঙ্কে। পিশাচীটা আমার দিকেই যেন ছুটে আসছে! তার আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলন্ত দু-চোখ ঘৃণা, নিষ্ঠুরতা ও বিদ্রূপ মেশানো, সে কি ভীষণ ক্রূর দৃষ্টি! সে পূতিগন্ধ, সে শেয়ালের ডাক, সে আগুন-রাঙা মেঘের সঙ্গে পিশাচীর সেই দৃষ্টিটা মিশে গিয়েছে একই উদ্দেশ্যে—সকলেই তারা আমায় নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করতে চায়।

যে শবটার ওপর ব'সে আছি—সে শবটা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বললে—আমায় উদ্ধার কর, রোজ রাত্রে এমনি হয় —আমায় খুন ক'রে মেরে ফেলেছে ব'লে আমার গতি হয় নি —আমায় উদ্ধার কর। কতকাল আছি এই শ্মশানে! ছাপ্পান্ন বছর·· কাকেই বা বলি? কেউ দেখে না।

ভয়ে দিশাহারা হয়ে আমি আসন ছেড়ে উঠে দৌড় দিলাম। তখন পুবে ফরসা হয়ে এসেছে।

বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান হ'লে চেয়ে দেখি আমার সামনে সেই পাগলী ব'সে মৃদু মৃদু ব্যঙ্গের হাসি হাসছে···সেই বটতলায় আমি আর পাগলী দু-জনে।

পাগলী বললে—যা তোর দৌড় বোঝা গিয়েছে। আসন ছেড়ে পালিয়েছিলি না?

আমার শরীর তখনও ঝিমঝিম করছে।

বললুম—কিন্তু আমি ওদের দেখেছি। তুমি যে ষোড়শী মহাবিদ্যার কথা বলতে, তিনিই এসেছিলেন।

পাগলী মুখ টিপে হেসে বললে—তাই তুই ষোড়শীর রূপ দেখে মন্ত্রজপ ছেড়ে দিলি। দূর, ওসব হাঁকিনীদের মায়া। ওরা সাধনার বাধা। তুই ষোড়শীকে চিনিস্ না, শ্রীষোড়শী সাক্ষাৎ ব্রহ্মশক্তি।

'এবং দেবী ত্র্যক্ষরী তু মহাষোড়শী সুন্দরী।'

ক'হাদি সাধনা ভিন্ন তিনি প্রকট হন না। ক'হাদি উচ্চতন্ত্রের সাধনা! তুই তার জানিস্ কি? ওসব মায়া।

আমি সন্দিগ্ধস্বরে বললাম—তিনি অনেক কথা বলেছিলেন যে! আরও এক বিকটমূর্তি পিশাচীর মতো চেহারা নারী দেখেছি।

আমার মাথার ঠিক ছিল না; তার পরেই মনে পড়ল, পাগলীর কথাও কি-একটা তার সঙ্গে যেন হয়েছিল—কি সেটা?

পাগলী বললে, তোর ভাগ্য ভালো। শেষকালে যে বিকটমূর্তি মেয়ে দেখেছিস্, তিনি মহাডামরী মহাভৈরবী—তুই তাঁর তেজ সহ্য করতে পারলি নে—আসন ছেড়ে ভাগলি কেন?

তারপরে সে হঠাৎ হি-হি ক'রে হেসে উঠে বললে—মুখপোড়া বাঁদর কোথাকার! উনি দেখা পাবেন ভৈরবীদের! আমি যাদের নাম মুখে আনতে সাহস করি নে—হাঁকিনীদের নিয়ে কারবার করি। ওরে অলপ্পেয়ে, তোকে ভেল্কি দেখিয়েছি। তুই তো সব সময় আমার সামনে ব'সে আছিস বটতলায়। কোথায় গিয়েছিলি তুই? সকাল কোথায়, এখন যে সারারাত সাধনা ক'রে আসন ছেড়ে এলি? এই ত সবে সন্ধ্যে—!

—অ্যাঁ!

আমার চমক ভাঙল। পাগলী কি ভয়ানক লোক! সত্যিই তো সবেমাত্র সন্ধ্যা হয়-হয়। আমার সব কথা মনে পড়ল। এসেছি ঠিক বিকেল ছ-টায়। আষাঢ় মাসের দীর্ঘ বেলা। মড়া ডাঙায় তোলা, শবসাধনা, নরকঙ্কাল, ষোড়শী, উড়ন্ত চিল-শকুনির ঝাঁক,—সব আমার ভ্রম!

হতভম্বের মতো বললাম—কেন এমন ভোলালে? আর মিথ্যে এত ভয় দেখালে?

পাগলী বললে—তোকে বাজিয়ে নিচ্ছিলাম। তোর মধ্যে সে-জিনিস নেই, তোর কর্ম নয় তন্ত্রের সাধনা। তুই আর কোনদিন এখানে আসবার চেষ্টা করবি নে। এলেও আর দেখা পাবি নে।

বললাম, একটা কথার শুধু উত্তর দাও। তুমি ত অসাধারণ শক্তি ধরো। তুমি ভেল্কি নিয়ে থাক কেন? উচ্চতন্ত্রের সাধনা কর না কেন?

পাগলী এবার একটু গম্ভীর হ'ল। বললে—তুই সে বুঝবি নে। মহাষোড়শী, মহাডামরী, ত্রিপুরা, এঁরা মহাবিদ্যা। ব্রহ্ম শক্তির নারীরূপ। এদের সাধনা এক জন্মে হয় না—আমার পূর্বজন্মও এমনি কেটেছে—এ-জন্মও গেল। গুরুর দেখা পেলাম না—যা তুই ভাগ, তোর সঙ্গে এ-সব ব'কে কি করব, তোকে কিছু শক্তি দিলাম, তবে রাখতে পারবি নে বেশি দিন। যা পালা—

চলে এলাম। সে আজ চল্লিশ বছরের কথা। আর যাই নি, ভয়েই যাই নি। পাগলীর দেখাও পাই নি আর কোনদিন।

তখন চিনতাম না, বয়েস ছিল কম। এখন আমার মনে

হয় যে, পাগলী সাধারণ মানবী নয়। সংসারের কেউ ছিল না সে, লোকচক্ষুর আড়ালে থাকবার জন্যে পাগল সেজে কেন যে চিরজন্ম শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াত—তুমি আমি সামান্য মানুষে তার কি বুঝব? যাক সে-সব কথা। শক্তি পাগলী দিয়েছিল, কিন্তু রাখতে পারি নি। ঠিকই বলেছিল, আমার মনে অর্থের লালসা ছিল, তাতেই গেল। কেবল চন্দ্রদর্শন এখনও করতে পারি। তুমি চন্দ্রদর্শন করতে চাও? এস, চিনিয়ে দেব। দুই হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে—

আমি দেখিলাম তারানাথের বকুনি থামিবে না, যতক্ষণ এখানে আছি। উঠিয়া পড়িলাম, বেলা বারোটা বাজে। আপাততঃ চন্দ্রদর্শন অপেক্ষাও গুরুতর কাজ বাকি। তারানাথের কথা বিশ্বাস করিয়াছি কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ইহার আমি কোনো জবাব দিব না।

## ডাকগাড়ি

এক এক সময় রাধা ভাবে কোথাও বেড়াইয়া আসিতে পারিলে ভালো হইত। আজ ছ' বছরের মধ্যে সে একখানা দুর্গা প্রতিমার মুখ পর্যন্ত দেখে নাই। এ গাঁয়ে সবাই গরীব, দুর্গোৎসব তো দূরের কথা, তেমন একটা জাঁকের কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত হয় না। অবশ্য এ গাঁয়েরই সে মেয়ে, এই অবস্থার মধ্যেই মানুষ হইয়াছে, বাল্যে সে ভাবিত সর্বত্রই বুঝি এই রকম ব্যাপার। কিন্তু বিয়ের পর বাসুদেবপুর গিয়া রাধা প্রথম বুঝিল, তাদের গাঁ অতি হীন অবস্থার গাঁ। গরীব আর বড়লোকে তফাত কি, বুঝিল। বাসুদেবপুর এমন কিছু শহর বাজার জায়গা নয়, গঙ্গার ধারে একখানা বর্ধিষ্ণু গ্রাম এই পর্যন্ত। সেখানে মুস্তফিরা বড় লোক, এমন পূজা নাই যে, তাদের বাড়ি হইত না—দুর্গোৎসব বল, শ্যামা পূজা বল, জগদ্ধাত্রী পূজা বল, এমন কি রথ পর্যন্ত।

বছর তিনেক বড়ই আনন্দে কাটিয়াছিল—সব দিক দিয়াই। তারপর তাহার স্বামী মারা গেল যকৃতের রোগে। শাশুড়ীর সঙ্গে রাধার বনিল না, দিনকতক উভয়ের মধ্যে যে সব বাক্যা-বলীর আদান-প্রদান চলিল, তাহাকে ঠিক সদয় ও ভদ্রবাক্য বলা চলে না। রাধা প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হইল, তাহার বাবা এত দরিদ্র আজও হন নাই যে, তাহাকে একবেলা এক মুষ্টি আতপ চালের ভাত দিয়া পুষিতে পারিবেন না। ফলে একদিন একটি মাত্র পুঁটুলি সম্বল করিয়া রাধা তাহার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে

বাপের বাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। ভাইটিকে সে-ই পত্র লিখিয়া আনিয়াছিল। তাহার তোরঙ্গ ও ক্যাশবাক্স শাশুড়ী আটকাইয়া রাখিলেন।

ছ' বছর তারপর কাটিয়া গিয়াছে।

সেই যে বিধবা হইয়া আসিয়া বাপের বাড়ি ঢুকিয়াছে, আর সে এ গ্রাম হইতে বাহির হয় নাই।

এই ছ' বছরে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল তাহাদের সংসারে। বাবা লেখাপড়া ভালো জানেন না, বিশ্বাসদের পাটের আড়তে কাজ করিয়া সামান্য কয়েকটি টাকা পাইতেন। বাবার সে চাকুরিটা গেল। রাধার ছোট একটা ভাই গেল মারা। বাবা বাত হইয়া কিছুদিন শয্যাগত থাকিলেন। বাবার সঙ্গে মায়ের মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে সামান্য কথায় ঝগড়া বিবাদ হইতে লাগিল। জমিদার নালিশ করিয়া তাহাদের বড় জমা ক্রোক করিয়া লইল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে দিনগুলি, সেই সংসারের কাজ, সেই গরুর সেবা, সেই রাঁধাবাড়া, বাবার হাতে পায়ে তেল মালিশ করা, মায়ের দোক্তার পাতা পুড়াইয়া তামাক তৈরি করা, কলের মতো একটানা একঘেয়ে ভাবে চলিতেছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

আজ সকালে ডোবার ধারে বাসন মাজিতে বসিয়া তাই সে ভাবিতেছিল, একবার কোথাও বেড়াইয়া আসিবে।

ছোট ডোবাটা। চারি পাড়ে বড় বড় গাছের ছায়ায় ঝুপসি অন্ধকার হইয়া আছে। দুপুর বেলাতেও রোদ পড়ে না। এইটুকু তো ডোবা, এর আবার চারিদিকে চারিটা ঘাট। বাঁধান নয়, কাঁচা ঘাট। দক্ষিণ দিকের জামতলায় জেলে পাড়ার ঘাট,

পশ্চিম পাড়ের বেলতলায় নাপিতদের ঘাট, পূবদিকে বামুন-পাড়ার ঘাট, উত্তর পাড়ে যাদের জমিতে ডোবাটা তাঁদের ঘাট। তাঁরাও ব্রাহ্মণ, নিজেদের জন্যে একটা ঘাট আলাদা রাখিয়াছেন, কাহাকেও সে ঘাটে যাইতে দেন না।

সেই বাড়িরই সুবি, ভালো নাম সুবিনীতা—তাদের ঘাটে চায়ের পাত্র ধুইতে নামিল। গ্রামের মধ্যে ওরা ওরই মধ্যে একটু শৌখীন, চা খাওয়ার অভ্যাস রাখে, সুবি কিছুদিন কলিকাতায় কাকার বাসায় থাকিয়া পড়িত। ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়িয়া পড়া ছাড়িয়া দিয়া আজ বছরখানেক বাড়িতে বসিয়া আছে। গ্রামের মেয়েদের মধ্যে তার প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই বেশি, কারণ গ্রামের মধ্যে সে-ই একমাত্র মেয়ে, যে স্কুলের মুখ দেখিয়াছে—তাও আবার কলিকাতায়। সুবি দেখিতে মোটামুটি ভালোই, রং উজ্জ্বল শ্যাম, বড় বড় চোখ, একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, সর্বদা ফিটফাট হইয়া থাকে, একটু চালবাজ। ষোল বছর বয়েস, বিবাহের চেষ্টা চলিতেছে। রাধা সুবি বলিতে অজ্ঞান, কিন্তু সুবি তাকে বড় একটা আমল দেয় না। গরীব ঘরের মেয়ে, বাইশ তেইশ বছর বয়েস, তার ওপরে বিধবা এবং লেখাপড়াও তেমন কিছু জানে না—এ অবস্থায় রাধা কি করিয়া আশা করিতে পারে যে, সে কলিকাতার স্কুলের ক্লাস এইট্ পর্যন্ত পড়া মেয়ে সুবির অন্তরঙ্গ মণ্ডলীতে স্থান পাইবে। তা সে পারে না—বা সে আশা করা তার উচিতও নয়।

সুবিকে জলে নামিতে দেখিয়া রাধার মুখ ঠিক আগ্রহে ও আশায় উজ্জ্বল দেখাইল।

সে বলিল—ও সুবি ভাই, তোদের চা খাওয়া হয়ে গেল?

সুবি কচুর ঝাড়ের গোড়া হইতে চায়ের পেয়ালা লইয়া জল

বুলাইতে বুলাইতে বলিল—হয় নি। মার তো আজ সোমবার, মা খাবে না—শুধু আমি আর যাদু। তাড়াতাড়ি নেই, এইবার গিয়ে জল চড়াব।

সুবি নিজে থেকে কোনো কথা বড় একটা রাধার সঙ্গে বলে না—তবে রাধা যে কথা জিজ্ঞাসা করে, ভদ্রভাবে তার উত্তর দেয়।

রাধা জানে সুবি সাংসারিক কথাবার্তা বলিতে ভালোবাসে না। পড়াশুনা, গান, ফিল্ম, কবিতা প্রভৃতি তাহার কথাবার্তার বিষয়। কলিকাতায় থাকিয়া তাহার রুচি বদলাইয়া গিয়াছে।

রাধা তাহার মন যোগাইয়া চলিবার চেষ্টায় বলিল—কাল সন্ধ্যেবেলা তুই এলিনে ভাই, আমি কতক্ষণ বসে বসে একটা কবিতা মুখে মুখে বানালাম। তোকে শোনাব আজ দুপুরে।

—কি কবিতা?

—আসিস, এখন না। শোনাব। মুখস্থ নেই, ভাই।

সুবি আর কোন আগ্রহ দেখাইল না। শুধু বলিল—দুপুরে মা কাঁথা সেলাই করবে, আমাকে কাছে বসে স্ঁচে সুতো পরাতে হবে। আমার যাওয়া তো হবে না।

রাধা বলিল—সেই গানটা একটু গা না সুবি?

সুবি চায়ের পাত্রগুলি হাতে লইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত অবস্থায় বলিল—এখন সময় নেই। অনেক কাজ। চলি।

রাধা অতি করুণ মিনতির সুরে বলিল—গা না ভাই, দুটো লাইন গা। বলচি এত করে'—

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি পাড়াগাঁয়ের মেয়ের তুলনায় সুবি গান গাহিতে পারে মন্দ নয়। কলিকাতায় থাকিবার সময় নিধুদা'র কাছে সে অনেক গান শিখিয়াছিল। নিধুদা' তার কাকীমার

পিসতুতো ভাইয়ের ছেলে। কলেজে পড়ে, বেশ গান গাহিতে পারে, চেহারাও ভালো। সুবিকে দিনকতক সে গান শিখাইতে ঘন ঘন আসিত।

সুবি গুন্ গুন্ করিয়া মাত্র দু' কলি গাহিল—

যৌবন সরসী-নীরে
মিলন শতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলমল টলমল!

ঠিক এই সময় নাপিতদের ঘাটে নাপিত-বৌ এক কাঁড়ি বাসন লইয়া মাজিতে আসিল। নাপিত-বৌ শ্যামবর্ণ, বয়স উনিশ কুড়ি, খুব সুন্দর নিটোল গড়ন, স্বাস্থ্যবতী, মুখশ্রীর মধ্যে একটা সুলভ ও সহজ সৌন্দর্য আছে—অর্থাৎ যে শ্রীটা এই বয়সেই থাকে, পাঁচ বছর পবে যাহার আর বিশেষ কিছু অস্তিত্ব থাকিবে না। কিন্তু এখন যখন সেটা আছে, তখন খুব জমকালো ভাবেই আসর মাতাইয়া রাখিয়াছে।

নাপিত-বৌ সুবিকে প্রায় পূজা করিয়া থাকে মনে মনে। তাহার জীবনে এমন মেয়ে সে দেখে নাই। অমন রূপ, অমন কথাবার্তা, অমন লেখাপড়া, অমন গান—সকল দিকেই সুবি নাপিত-বৌয়ের মন হরণ করিয়া লইয়াছে। যে পাড়াগাঁয়ে নাপিত-বৌয়ের বাপের বাড়ি, সে গাঁয়ে এমন একটি মেয়ের কল্পনাও করা শক্ত। ইহার সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ পাইয়া সে ধন্য হইয়া গিয়াছে। নাপিত-বৌ আঁচলের চাবিটা শক্ত করিয়া গেরো দিতে দিতে সুবির দিকে প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া গান শুনিতে লাগিল।

বলিল—ভারি চমৎকার গলা দিদিমণি আপনার। কখনো এমন শুনিনি, কি গানটা দিদিমণি?

সুবি পদগুলি আবৃত্তি করিয়া গানটি বলিয়া গেল।

নাপিত-বৌ গানের ভাষা বিন্দুবিসর্গও বুঝিল না। সুবির মন যোগাইবার জন্য একমনে শুনিবার ভান করিয়া মাঝে মাঝে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

সুবি ভাবিতেছিল, এ বর্বরদের গান শুনাইয়া লাভ কি? আজকাল তাহার গলা সত্যিই ভালো হইয়াছে। নিধুদা যদি শুনিত!······

আর কলিকাতায় যাওয়া হইবে না······নিধুদা'র সঙ্গে দেখাও আর হইবে না। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ খোঁজা চলিতেছে, স্কুল ছাড়াইয়া আনিয়া বাড়িতে রাখা হইয়াছে। বয়েস ষোল ছাড়াইতে চলিল কি না! আর বাড়ির বাহির হইবার হুকুম নাই। কলিকাতা ··চিত্রা···রূপবাণী···কেতকী···শোভা, নিধুদা'··· সব স্বপ্ন···এ জন্মের মতন সব ফুরাইয়াছে···সোনার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য নয় যে, তেইশ বছরের বিধবা রাধার ঘনিষ্ঠতা তাহার ভালো লাগে না। নাপিত-বৌ তাহার পায়ের তলায় পোষা কুকুরের মতো পড়িয়া থাকে, কোনো রকমে সহ্য করিয়া থাকিতে হয়। ঝি-চাকরকেও তো লোকে সহ্য করে।

রাধা বলিল—ভাই সুবি, তোর গলাখানা যদি একবার পেতাম! হিংসে হয়, সত্যি।

সুবি নাপিত-বৌয়ের খোসামোদ ও রাধার গায়ে পড়িয়া আলাপ জমানোর চেষ্টা ঠেলিয়া ফেলিয়া চায়ের পাত্র লইয়া চলিয়া গেল। সে মরিতেছে নিজের জ্বালায়, এমন সময়ে এ-সব ন্যাকা ন্যাকা কথা তাহার ভালো লাগে না।

জেলেপাড়ার ঘাটে ছিপছিপে, ফরসা, থান-পরা জেলে-বৌ কাপড় কাচিতে নামিল।

রাধা বলিল—ও রামুর মা, রামুর কোনো খবর পেলে ?

জেলে-বৌ বলিল—কোথায় দিদিঠাকরুণ—আজ পাঁচ মাস ছেলে গিয়েচে, একখানা পত্তর নয়—টাকা পাঠানো চুলোয় যাক—তার টাকা পাঠাতে হবে না। আনি ধান ভেনে, ক্ষার কেচে, গতর খাটিয়ে যেমন চালাচ্চি, এমনি চালিয়ে যেতে পারলে বাঁচি। ছেলের রোজগার খেতে চাইনে, সে ভালো থাকুক, নিজের খরচ নিজে করুক, তাতেই আমি খুশি। কিন্তু বলো তো দিদিঠাকরুণ, একখানা চিঠি নেই আজ পাঁচ মাস, আমি কি ক'রে ঘরে থাকি ?

রামু লালমণিরহাটে রেলে কি একটা চাকরি পাইয়া গিয়াছে। মাকে একবার পাঁচটি টাকা পাঠাইয়াছিল—তারপর এখন লেখে যে, সামান্য মাইনেতে তাহার কুলায় না, মাকে এখন আর টাকা পাঠাইতে পারিবে না। মা যেন কষ্ট করিয়া পূজা পর্যন্ত কোনো রকমে চালাইয়া লয়! ছেলের কষ্ট হইবার ভয়ে মাও আর টাকা চায় না। কষ্টে-সৃষ্টেই চালায়।

রাধার জেলে-বৌকে ভালো লাগে বড়।

এমন ধরনের মেয়ে এ গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থের ঘরেও নাই। এত সুন্দর মন ওর, পরের উপকারে প্রাণ ঢালিয়া দিতে এমন লোক সত্যিই গাঁয়ে আর নাই। শুধু রাধাদের বলিয়া নয়, লোকের চিঁড়ে কুটিতে জেলে-বৌ, ধান ভানিতে জেলে-বৌ, যাহাদের বাড়িতে পুরুষ মানুষেরা বিদেশে থাকে, শুধু বাড়িতে মেয়েরা আছে—এক ক্রোশ দূরবর্তী বাজার হইতে তাদের হাট-বাজার করিয়া দিতে জেলে-বৌ, কুটুম্ব বাড়িতে তত্ত্বতাবাস পাঠাইতে কিংবা নব-বিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাইতে জেলে-বৌ—জেলে-বৌ না হইলে এ গাঁয়ের লোকের

চলে না। অথচ এ সবের জন্যে জেলে-বৌ কারো কাছে একটি পয়সা প্রত্যাশা করে না—পাড়ার পাঁচজনের বিনি পয়সায় বেগার খাটিয়া বেড়ানোই তার অভ্যাস।

গত জ্যৈষ্ঠ মাসে রাধার মনে আছে—আমবাগানের পথ দিয়া সে ঘাটে যাইতেছে—জেলে-বৌ আম কুড়াইতেছে বাগানে।

রাধা বলিল—রামুর মা, আম কুড়ুচ্চ? দেখি কোন্ কোন্ গাছের, ও গুয়োথলীর আম পেয়েছ যে দেখচি!···ও বাবা, ও তো বড় একটা পাওয়া যায় না। আমি কত খুঁজি, একটাও পাইনে একদিনও। তোমার ভাগ্যি ভালো। ভারি বোঁটা শক্ত আম, তলায় পড়েই না।

অত মিষ্টি গাছের আম, আর পাওয়া অত শক্ত, মাত্র তিনটি আম পাইয়াছিল জেলে-বৌ, অমনি হাসিমুখে বলিল,—তা নিয়ে যান দিদিঠাকরুণ, আম ক'টা আপনি সেবা করবেন। দয়া ক'রে নিয়ে যান আপনি। জেলে-বৌএর গুণ আছে, অত সহজে ত্যাগ স্বীকার করিতে ওর জুড়ি নাই এ গাঁয়ে।

রাধা আম লইয়াছিল এই জন্যে যে, না লইলে জেলে-বৌ ভাবিবে, ছোট জাতের দান বলিয়া ব্রাহ্মণের মেয়ে সকালবেলা গ্রহণ করিল না। লইয়া সে ভাবিল—জেলে-বৌএর আপন-পর জ্ঞান থাকতো, যদি এ গাঁয়ে হাঙ্গামা পোয়াতে হ'ত তা হ'লে।

রাধা বলিল—জেলে-বৌ, আমার সঙ্গে একবার শ্বশুরবাড়ি চল না? অনেক দিন কোথাও বেরুই নি, ভাবচি দিনকতক ঘুরে আসি।

জেলে-বৌ বলিল—যান না দিদিঠাকরুণ। আপনাদের যাবার জায়গা আছে কেন যাবেন না। শ্বশুরবাড়ি যানও নি তো অনেকদিন। তাঁরা দেখলে খুশি হবেন।

সে বিষয়ে রাধার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শাশুড়ী তাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারে না, তা রাধার জানিতে বাকী নাই। তবুও যাইতে হইবে, তোরঙ্গ আর ক্যাশ বাক্সটা সেখানে ছাড়িয়া আসায় লাভ কি? সেগুলো আনা দরকার। অমন ভালো তোরঙ্গটা।

পরদিন বাবা-মাকে কথাটা বলিতেই বাড়িতে একপালা ঝগড়া শুরু হইল। রাধার বাবার আদৌ মত নাই সেখানে মেয়ে পাঠাইতে, রাধার মা কিন্তু রাধার দিকে। দু'জনে এই লইয়া বাধিল ঘোরতর দ্বন্দ্ব।

রাধা বাবাকে বলিল, আমি ঘরে আসব তো বলচি সাত দিনের মধ্যে। নবুকে সঙ্গে নিয়ে যাই—না থাকতে দেয়, আসা তো আমার হাতের মুঠোয়। একঘেয়ে ভালো লাগে না এখানে।

রাধার বাবা বলিলেন—এ অপমান সাধ ক'রে কুড়ুবার কি দরকার তোর? তারা কি এই দু'বছরের মধ্যে একখানা পত্তর দিয়ে খোঁজ নিয়েচে যে তুমি কেমন আছ?

অনেক কষ্টে অবশেষে বাবাকে নিমরাজি গোছের করাইয়া ছোট ভাইকে সঙ্গে লইয়া রাধা আসিয়া গাংনাপুর স্টেশনে গাড়ি চাপিল।

রেলগাড়িতে চাপিয়া রাধার মনে হইল সে মুক্তির স্বাদ পাইয়াছে বহুদিন পরে। কেবল বাবা মায়ের একঘেয়ে ঝগড়া অশান্তি, কেবল নাই নাই শুনিতে শুনিতে তাহার তরুণ মন অকালে প্রৌঢ়ত্বের দিকে চলিয়াছে। সংসারে আলো নাই, বাতাস নাই, এতটুকু আনন্দ নাই—শুধুই শোনো চাল নাই, কাঠ নাই, একাদশীর আটা কোথা হইতে আসিবে, নবুর কাপড়

ছিঁড়িয়া গিয়াছে, নতুন একটা ইজের ছ' আনা হইলে পাওয়া যায়, তা যেন ছ'টি মোহর। নবুর পাঁচ মাসের স্কুলের মাইনে বাকি, ছুবেলা মাষ্টারে শাসায়, মুখুয্যেদের বাড়ির ঠাকুমার দেনার টাকার স্থদের তাগাদা আর বাবার যত মিথ্যে কথা বানাইয়া বলা পাওনাদার বিদায় করিতে। আজ সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

রাণাঘাট স্টেশনে গাড়ি বদল করিয়া মুর্শিদাবাদ লাইনের গাড়িতে চাপিতে হইল। মুড়াগাছায় নামিয়া ক্রোশখানেক হাঁটিয়া বৈকাল তিনটার সময় সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়া পৌছিল।

শাশুড়ী বৌকে দেখিয়া বলিলেন—এই যে নবাবের মেয়ে, তা এতদিন পরে কি মনে ক'রে? সঙ্গে কে? ছোট ভাই—ও সেই নবু না? এসো এসো বাবা, স্থখে থাকো, চিরজীবী হও। তা বেশ ছেলেটি।

কিন্তু শাশুড়ীর অমায়িকতা তিনদিনের মধ্যেই ঘুচিয়া গেল। রাধার বিধবা বড় ননদ ভ্রাতৃবধূকে 'পুনরায় এ বাড়িতে আসিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হন নাই। রাধার গলার ছ'ভরির হার সেবার শাশুড়ী কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন, সেই হারছড়া ভাঙিয়া ননদের মেয়ের বিয়ের সময় হাতের রুলি আর বালা গড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বড় ননদ ভাবিয়াছিলেন, আজ ছ'বছর যে বৌ এ বাড়ি আসে নাই, সে আর আসিবে না। কিন্তু আপদ আবার আসিয়া যখন জুটিল, তখন তো হারের দাবি করিয়া বসিবে। হইলও তাই। রাধা শাশুড়ীর কাছে হার চাহিল। শাশুড়ী বলিলেন—তোমার বাবা যে টাকা বিয়েতে দেবেন বলেছিলেন, তা দেন নি—ছুশো টাকা বাকি ছিল। তার দরুণ হার রেখে দিই। সে টাকা নিয়ে এসো আগে, হার এখুনি বার ক'রে দিচ্ছি।

বড় ননদও এই কথায় সায় দিলেন।

রাধা বলিল—বারে, আমার বাবার গড়িয়ে দেওয়া হার, তোমরা তো আর দাওনি? বাবা টাকা দিয়েছেন কিনা সে তোমরা বোঝ গিয়ে তাঁর সঙ্গে। আমার হার কেন তোমরা দেবে না?

কিন্তু টাকাকড়ির কথা আর কি অত সহজে মেটে!

রাধা বলিল, আমার বাবার দেওয়া তোরঙ্গ, তাই বা তোমরা কেন আটকে রাখবে? আর তোরঙ্গের চাবি ভেঙ্গে তোমরা জিনিসপত্র বার করে নিয়েছ কেন?

শাশুড়ী ও ননদ দুজনে মিলিয়া বলিলেন, চাবি কেহ ভাঙ্গে নাই, ভাঙ্গাই ছিল।

রাধা বলিল, আমার নতুন তোরঙ্গ, চাবি ভাঙ্গা থাকলেই হ'ল? তোমরা ভেঙ্গেচ। যত চোরের ঝাড়, দাও আমার হারছড়া—

শাশুড়ী বলিলেন, মুখ সামলে কথা বলো বৌমা, বলচি—

উভয়পক্ষে তুমুল ঝগড়া বাধিয়া গেল। ননদ মারিতে আসিলেন ভ্রাতৃবধূকে। নবুকে সেদিন আর কেহ খাইতে ডাকিল না। রাধার তো কথাই নাই, তাহাকে কে আদর করিয়া খাওয়াইবে, সে যখন তার বিবাহের হার ও তোরঙ্গ চাহিতে আসিয়াছে?

দুপুরের পরে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া নবুকে সঙ্গে লইয়া রাধা ধর্মদহ গ্রাম হইতে মুড়াগাছা স্টেশনে হাঁটিয়া আসিল। দুজনেরই অনাহার। মনে পড়িল এই শ্রাবণ মাস, এই শ্রাবণ মাসেই সে ওই পথেই একদিন পালকি করিয়া নববধূরূপে আসিয়াছিল। কথাটা মনে আসিতেই রাধার চোখে জল বাধা মানিল না। স্টেশনে আসিবার সারা পথটাই সে কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল।

ট্রেণটি আসিলে তাহাতে কলের পুতুলের মতো বসিয়া রাধা কত কথা ভাবিতে লাগিল। মিছামিছি প্রায় তিনটা টাকা খরচ হইয়া গেল। এ টাকা অবশ্য তাহার বাপের বাড়ির নয়—তাহার নিজেরই জমানো টাকা। টাকাটা হাতে থাকিলে টানাটানির সংসারে কত কাজ দিত। বাবার অমতে আসা হইয়াছে, শুধু হাতে ফিরিলে বাবার বকুনি খাইতে হইবে, মা মুখ ভার করিয়া থাকিবে। ছ'ভরির হারছড়া—লইয়া যাইতে পারিবার আশা করিয়াই সে আসিয়াছিল। বাবা মায়েরও সে আশা যে একেবারে না ছিল তা নয়। এবার সকলে রাগ করিবে। তা ছাড়া ভবিষ্যতে শ্বশুরবাড়ি আসিবার পথও গেল। শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া না করিলেই হইত। না হয় গিয়াছেই হারছড়াটা! বাপ মায়ের অবর্তমানে শ্বশুরবাড়িতে একটু দাঁড়াইবার স্থানও তো হইত! তাহার জীবনে কোন সুখ নাই। বাড়ি গিয়া তো সেই একঘেয়ে ব্যাপার। সেই ডোবার ধারে সকালে বাসন মাজা, সেই গোয়াল পরিষ্কার, সেই রাঁধাবাড়া। সুবি—তা সে-ও তেমন মন খুলিয়া কথা কয় না। সে অনেক কিছু ভুলিতে পারিত, যদি সুবি তাহার সঙ্গে হাসিয়া আলাপ করিত, প্রাণ খুলিয়া মিশিত। তা করে না—কত করিয়া সাধিয়া কত ভাবে মন যোগাইয়া রাধা দেখিয়াছে।

সত্যি জীবন সব দিক দিয়াই অন্ধকার। বাঁচিয়া কি সুখ?

কাল সকালে কি হইবে সে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে। রাত্রে আজ সে বাড়ি ফিরিলেই বাবার সঙ্গে মায়ের ঝগড়া বাধিবে। অর্থাৎ সে হার আদায় করিতে না পারিয়া ফিরিলেই বাবার আশাভঙ্গের রাগটা গিয়া পড়িবে মা'র উপর, দুজনে ধুন্ধুমার বাধিয়া যাইবে। কাল সকালে ডোবাতে বাসন মাজিবার

সময় মুখুয্যে পাড়ার ঘাট, জেলে পাড়ার ঘাটের সবাই জানিতে চাহিবে সে এত শীঘ্র শ্বশুরবাড়ি হইতে ফিরিল কেন। শাশুড়ী কি করিল, কি বলিল—এই কৈফিয়ত দিতে দিতে আর মিথ্যা কথা বানাইয়া বলিতে বলিতে তাহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিবে। কারণ, সত্যকথা তো সে বলিতে পারিবে না! রায়-বাড়ির কুচুটে মেজ বৌ মুখ টিপিয়া হাসিবে। সুবি নামিবে ওদের নিজেদের ঘাটের কচুতলায় চায়ের বাসন ধুইতে। নিজে হইতে একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিবে না যে, রাধা কবে আসিল বা কিছু। রাধাকে প্রথমে কথা বলিতে হইবে। সুবি দু'একটা 'হাঁ' 'না' গোছের দায়সারা উত্তর দিয়া চায়ের পেয়ালা পিরিচ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া যাইবে, যেন বেশীক্ষণ ডোবার ঘাটে দাঁড়াইয়া ওর সঙ্গে কথা বলিলে তার আভিজাত্য খর্ব হইয়া যাইবে। বাসন-মাজার পরে ঘাটে যাওয়া, রান্না, খাওয়ানো দাওয়ানো, দুপুরে পান মুখে দিয়াই ছুটিতে হইবে ঘাটে, গরুকে জল খাওয়াইতে সে নদীর ধারের মাঠে, যেখানে গরুকে গোঁজ পুঁতিয়া রাখিয়া আসা হইয়াছে। সেই সময়টা যা একটু ভালো লাগে—নীল আকাশ, নদীর ধারে কাশ ফুল দোলে, মস্ত জিউলি গাছের গা বাহিয়া সাদা সাদা মোম-বাতি-ঝরা মোমের মতো আটা ঝরিয়া পড়ে, হু হু খোলা হাওয়া বয় ওপারের দেয়াড়ের চর হইতে, পাট-বোঝাই গরুর গাড়ির দল ক্যাঁচ কোঁচ করিতে করিতে ঘাটের পথের রাস্তা দিয়া কোথায় যেন যায়। গরুকে জল দেখাইয়া আসিয়া তাহার বড় ইচ্ছা করে সুবিদের বাড়িতে সুবির সঙ্গে বসিয়া একটু আধটু গল্প-গুজব করে, দু'একখানা বর্ণ-সূচি পড়িয়া শোনায়—(কারণ সে বই পড়িতে জানে না) গান শোনায়—কিন্তু হায় রে দুরাশা! গায়ে পড়িয়া আলাপ

জমাইতে গেলে সুবি গভীর ঔদাস্যের সুরে বলিবে—হ্যাঁ, যাই রাধাদি। কত কাজ পড়ে রয়েচে, বিনুর সেই মোজা জোড়াটা বুনতে বুনতে ফেলে রেখেছি, সেটা সম্পূর্ণ শেষ করে ফেলি গিয়ে। বসো তুমি—মা'র সঙ্গে কথা বলো।

তার পর বেলা পড়িয়া যাইবে। রোয়াকে কাস্তে বঁটি পাতিয়া একরাশ বিচুলি কাটিতে হইবে, গরুকে জাব খাওয়াইতে। মাঠ হইতে গরু অবশ্য মা-ই আনে, কারণ এ সময়টা সে কাজে এত ব্যস্ত থাকে যে, নদীর ধারের মাঠ হইতে গরু আনিবার সময় তার বড় একটা হয় না। তারপর বাইরের বেড়ার গা হইতে শুকনো কাপড় তুলিতে হইবে, ঘর ঝাঁট দিতে হইবে, লণ্ঠনে তেল পুরিয়া কাঁচ মুছিয়া রাখিতে হইবে, গা ধুইয়া আসিতে হইবে, পাতকুয়া তলায় সাঁজ জ্বালিয়াই বাবার মিছরি মরিচ গরম করিয়া দিয়াই রাত্রের ভাত চড়াইতে হইবে। সকলের খাওয়া দাওয়া সারা হইলে সে নিজে এক মুঠা চালভাজা তেল-নুন মাখিয়া এক ঘটি জল খাইয়া বাবার পায়ে বাতের তেল মালিশ করিতে বসিবে। এই সব সারিতে রাত সাড়ে দশটার গাড়ি গড় গড় করিয়া মাত্‌লার বিলের পুলের উপর দিয়া যাইবার শব্দ পাওয়া যাইবে।

তবে দিনের মতো ছুটি। এই চলিবে দিনের পর দিন, তিন শো ত্রিশ দিন।

হঠাৎ নবু জানালার বাহিরে হাত বাড়াইয়া আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—উই রাণাঘাটের ইষ্টিশান দেখা যাচ্ছে দিদি—

রাধার চমক ভাঙিল।

সে মুখ বাড়াইয়া দেখিল, প্রকাণ্ড ট্রেণটা অজগর সাপের মতো বাঁকিয়া রেল স্টেশনের নিকটবর্তী হইতেছে। যেখানে

তার ইঞ্জিন, সেখানে দূরে একটা বড় বাড়ি ও টিনের ছাদ দেওয়া দালান মতো দেখা যাইতেছে। রাণাঘাট পৌঁছিয়া গেল এর মধ্যে।

প্লাটফর্মে নামিয়াই নবু বলিল—একখানা পাঁউরুটি কিনে দ্যাওনা দিদি! কি খিদেই পেয়েছে—ডাক্‌ব?

আঁচলের গেরো খুলিয়া তিনটি পয়সা বাহির করিয়া রাধা ভাইকে একখানা পাঁউরুটি কিনিয়া দিল। তাহার নিজেরও খুব ক্ষুধা পাইয়াছে—সেও তো সারাদিন কিছু খায় নাই। ভাইকে বলিল—আর কিছু খাবি? এক কাজ কর বরং, চল বাইরের দোকান থেকে আলুর দম কিনে দিই এক পয়সার। পাঁউরুটি দিয়ে খা, পেট ভরবে এখন।

নবু বালিল—তুমি কিছু খাবে না, দিদি?

—আমি রেলের কাপড়ে কি খাব? চা খেতে পারি, ওতে দোষ নেই—যা দিকি ঐ চা বিক্রি করচে, জেনে আয় কত করে নেবে এক পেয়ালার দাম। নবু জানিয়া আসিয়া বলিল—এক পেয়ালা চা চার পয়সা, দিদি।

—উঃ বাবা, চার পয়সা। তবে থাক্ গে। মোটে আর ন'টি পয়সা আছে। বাবার জন্য একখানা পাঁউরুটি কিনে নিতে হবে। দুধ দিয়ে পাঁউরুটি খেতে ভালোবাসেন বাবা। মা'র জন্য কি নেব বল্‌ত?

রাণাঘাট স্টেশনে দাঁড়াইয়া রাধার মনের দুঃখ অনেকটা চলিয়া গিয়াছে। কত লোক-জন, গাড়ি-ঘোড়া, দোকান, পসার—দেখিলে মনে শান্তি পাওয়া যায়।

এমন সময়ে প্লাটফর্মে একটা শব্দ উত্থিত হইল—লোক-জন, পানওয়ালা, পাঁউরুটিওয়ালারা, সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। লোক যে

যেখানে ছিল দাঁড়াইয়া উঠিল। রাধা একটি কুলিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, ডাক-গাড়ি আসিতেছে। দার্জিলিং মেল।

অল্পক্ষণ পরেই সশব্দে বিশাল ট্রেণখানা প্লাটফর্মের ও প্রান্তে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে ভিড়, হাঁকাহাঁকি, লোক-জনের দৌড়াদৌড়ি, পুরি-তরকারি, পান-বিড়ি-সিগারেট, কুলি কুলি, ইধার আও, হৈ-হৈ ব্যাপার। স্টেশন সরগরম হইয়া উঠিল; রাধা আর নবু যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তারই সামনে ডাক-গাড়ির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী কামরাগুলি থামিল।

রাধা অবাক্ হইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল। ঝকঝক তকতক করিতেছে কামরাগুলি। কি রকম পুরু চামড়ার গদি-আঁটা বেঞ্চি। সাহেব, মেম, মোমের পুতুলের মতো তাদের ছেলেমেয়েরা···দামী শাড়ি-পরা সুন্দরী বাঙালী বড়লোকের মেয়েরা···সুবি কোথায় লাগে এদের কাছে? বেহারারা ট্রের উপর চায়ের জিনিস বসাইয়া ছুটাছুটি করিতেছে···একটি অতি সুন্দর ছ' সাত বছরের ফ্রক্-পরা সাহেবদের মেয়ে প্লাটফর্মে নামিয়া লাফাইতেছিল—তার মা আসিয়া তার হাত ধরিয়া গাড়ির মধ্যে উঠাইয়া লইতে লইতে কি বলিল—হিট্ হিট্ প্রিং প্রিং—কেমন মজার কথা ওদের?···হাসি পায় শুনিলে। সত্যি কি চমৎকার দেখিতে খুকিটা?

নবু বলিল—এই দিকে এসে ত্যাখো দিদি, খাবার গাড়ি।

একখানা খুব বড় লম্বা গাড়ির মধ্যে সারি সারি টেবিল পাতা, টেবিলের উপর ধপ্ধপে চাদর, কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজানো, চকচকে সব কাঁচের বাসন। মেলা সাহেব মেম খাইতে বসিয়াছে। বাঙালীর মেয়েও আছে তাদের মধ্যে। তবে বেশি নয় দু' একজন। আঠারো উনিশ বছরের একটি বাঙালীর মেয়ে বেশি

দামের টিকিটের কামরা হইতে নামিয়া প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া জল কিনিতেছে।

রাধা কি দেখিল, কি পাইল জানিনা কিন্তু ডাকগাড়িখানা তার সুশ্রী সুবেশ আরোহীদল ও সুসজ্জিত ঝকঝকে তকতকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাগুলি লইয়া তাহার মনে একটি অপূর্ব আনন্দ, উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করিল। সমস্ত দার্জিলিং মেলখানা যেন একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা—কিংবা কোনো প্রতিভাবান গায়কের মুখে শোনা সঙ্গীত। রাধার মনে হইল, এই ভালো কাপড়-চোপড়-পরা সুন্দর চেহারার মেয়ে-পুরুষ, বালক-বালিকাদেব সে দেখিতে পাইতে পারে—যদি মাত্র ছ' আনা পয়সা খরচ করিয়া রাণাঘাট স্টেশনে আসে। যে পৃথিবীতে এবা আছে, সেখানে তার বাবার বাতেব বেদনা, স্থবির হৃদয়হীনতা, মায়েব খিটখিটে মেজাজ, বাবা-মায়ের ঝগড়া, শাশুড়ীর নিষ্ঠুর ব্যবহার সব ভুলিয়া যাইতে হয়, এমন কি তার ছ' ভরির হারছড়ার লোকসানের ব্যথাও যেন মন হইতে মুছিয়া যায়। কি চমৎকার! দেখিলে জীবন সার্থক হয় বটে, মন ভরিয়া ওঠে বটে। সংসারে এত সুখ, এত রূপ, এত আনন্দও আছে!

পূর্বেই বলিয়াছি, রাধা কি বুঝিল, কি পাইল জানি না— কিন্তু একথা খুবই সত্য যে, মেল গাড়িখানা ছাড়িয়া গেলে রাধা দেখিল যে, সে যেন নতুন মানুষ হইয়া গিয়াছে। মনে নতুন উৎসাহ, হাতে পায়ে নতুন বল, চোখে নতুন ধরনের দৃষ্টি। সে যেন রাধা নয়—যে সংসারে অসহায়, অনাহূত, উপেক্ষিত, অবলম্বনহীন এবং যার শেষ সম্বল ছ' ভরির হারছড়াটা পর্যন্ত শাশুড়ী ঘুচাইয়া দিয়াছে। একটুখানি সহানুভূতির কথা ও

মিষ্টি হাসির লোভে তাকে কালই ডোবার ঘাটে স্থবির অজস্র খোসামোদ করিতে হইবে।

নবুকে বলিল—ওদের কাছ থেকে এক পেয়ালা চা নিয়েই আয় নবু, তুই আর আমি ভাগ করে খাই। যাক গে চার পয়সা। আমাদের ট্রেণের এখন অনেক দেরি। ততক্ষণ এক পেয়ালা চা খেয়ে নেওয়া যাক। বাড়ি গিয়ে যেন মা'র কাছে বলিস্ নে।

# অকারণ

মনটা ভালো ছিল না। এক একদিন এ রকম হয়।

কিছু পড়তে ভালো লাগে না, কিছু ভাবতে ভালো লাগে না, কারুর সঙ্গে কথা বলতেও ভালো লাগে না। মনে হয়, যেন মনের চাকার তেল ফুরিয়ে গিয়েচে—'অয়েল' না ক'রে নিলে চাকা আর চলবে না, ক্রমে মরচে পড়ে আস্‌বে। তারপর কবে একদিন ফুট্‌ করে বন্ধ হয়ে যাবে।

জেলেপাড়া লেনে এক পুরোনো তাসের আড্ডায় গেলুম। সেই সব পুরোনো বন্ধুরা এসে জুটেচে—তাস কিন্তু ভালো লাগল না। তাস খেলে জিতব, অন্যদিন এতে কত উৎসাহ, আনন্দ পাই। আজ মনে হ'ল, না হয় জিতলামই, তাতেই বা কি ?—এদের গল্প-গুজব ভালো লাগল না। অর্থহীন—অর্থহীন—এই নিচু বৈঠকখানা ঘর, চূণ বালিখসা দেওয়াল, সেই সব একঘেয়ে সস্তা ওলিওগ্রাফ্‌ ছবি—কালীয়দমন, অন্নপূর্ণার ভিক্ষাদান, কি একটা মাথামুণ্ডু ল্যাণ্ড্‌স্কেপ্‌—একঘেয়ে কথাবার্তা, চিরকাল যা শুনে আসচি—হঠাৎ মন বিরস ও বিরূপ হয়ে উঠল—সব বাজে, সব অর্থহীন,—পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনার বেশ ভালো লাগচে ? মনে কোনো রকম—

সে অবাক্ হয়ে আমার দিকে চেয়ে রইল। বললে—কেন, ভালো লাগচে না কেন ? কেন বলুন তো ?—

মন আরও তিক্ত হয়ে উঠল। কাজের ছুতোয় সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লুম। বেলা চারটে বাজে। ফিরিওয়ালারা গলির

মধ্যে হাঁকচে—ছেলেরা বই দপ্তর নিয়ে স্কুল থেকে ফিরচে—কলে জল পড়বার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে—গলির মোড়ে রোয়াকে-রোয়াকে এরই মধ্যে আড্ডা বসে গিয়েচে—।

একটা নিতান্ত সরু অন্ধকার গলি, পাশেই একটা মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গা। এই গলিটা দিয়ে যাতায়াত প্রায়ই করি—মিউনিসিপ্যালিটির নাইবার জায়গাটার পাশে একটা খোলার ঘর—এই ঘরখানা ও তার অধিবাসীরা আমার কাছে বড় কৌতূহলের জিনিস। হাত পাঁচেক লম্বা, চওড়াতে ওই রকমই হবে, এই তো ঘরখানা। এরই মধ্যে একটি পরিবার থাকে, স্বামী-স্ত্রী ও দুটি শিশু-সন্তান। না দেখ্‌লে বিশ্বাস করা শক্ত, এইটুকু ঘরে কি ভাবে এতগুলি প্রাণী থাকে—তাদের জিনিস-পত্র নিয়ে। কিন্তু সকলের চেয়ে অবিশ্বাসের বিষয় এই যে, ওই পাঁচ বর্গ-হাত ঘরের এক কোণেই ওদের রান্নাঘর। আমি যখন ওখান দিয়ে যাই, প্রায়ই দেখতে পাই—উনুনে কিছু-না-কিছু একটা চাপানো আছে। বৌটি ছোট্ট ছেলে কোলে নিয়ে রাঁধচে, না হয় দুধ জ্বাল দিচ্চে। তার বয়েস দেখলে বোঝা যায় না। তেইশও হতে পারে, ত্রিশও হতে পারে—চল্লিশও হতে পারে। ঘোমটার কাছে ছেঁড়া, আধ ময়লা শাড়ি পরনে। হাতে রাঙা কড় কি রুলি। চোখ মুখ নিষ্প্রভ, নির্বুদ্ধিতার ছায়া মাখানো। স্বামী বোধ হয় কোনো কারখানাতে মিস্ত্রীর কাজ করে, দু'একদিন সন্ধ্যার আগে ফেরবার সময় দেখেচি লোকটা কালি-ঝুলি মেখে ছোট্ট বালতি হাতে পাশের নাইবার জায়গায় ঢুকচে।

আজও ওদের দেখলুম। দোরের কাছে বৌটি ছেলে কোলে নিয়ে বসে আছে, ছেলেকে আদর করচে। নির্বোধের মতো

আমার দিকে একবার চেয়ে দেখলে। সেই পায়রার খোপের মতো ঘরটা, ছিটেবেড়ার দেওয়ালে মাটির লেপ, তার ওপরে পুরোনো খবরের কাগজ আঁটা, কাগজগুলো হল্‌দে বিবর্ণ হয়ে গিয়েচে—দড়ির আলনায় ময়লা কাপড়-চোপড় ঝুলচে।

মনটা আরও দমে গেল। কি ক'রে এরা এ থেকে আনন্দ পায়? কি ক'রে আছে? কি অর্থহীন অস্তিত্ব! কেন আছে? আচ্ছা, ও ছেলেটা বড় হয়ে কি হবে? ওই রকম মিস্ত্রী হবে তো, ওই রকমই খোলার ঘরে ছেলে বউ নিয়ে ওই ভাবেই মলিন, কুশ্রী, অন্ধকার, অর্থহীন জীবনের দিনগুলো একে একে কাটাতে কাটাতে এগিয়ে চলবে, ততোধিক দীন হীন মরণের দিকে। অথচ মা কত আগ্রহে খোকাকে বুকে আঁকড়ে আদর করছে, কত আশা, কত মধুর স্বপ্ন হয়তো—কিন্তু এখানেও আমার সন্দেহ এল। স্বপ্ন দেখবার মতো বুদ্ধিও বৌটির আছে কি? কল্পনা আছে? নিজেকে এমন অবস্থায় ভাবতে পারে যা বর্তমানে নেই কিন্তু ভবিষ্যতে হতে পারে ব'লে ওর বিশ্বাস? মনের গোপন সাধ-আশাকে মনে রূপ দিতে পারে? নিজের সঙ্কীর্ণ, অসুন্দর বর্তমানকে আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যতের মধ্যে হারিয়ে ফেলতে পারে?

বড় রাস্তার মোড়ে বইএর দোকানগুলো দেখে বেড়ালুম। রাশি রাশি পুরোনো বই, ম্যাগাজিন। অধিকাংশই বাজে। অলস অপরিণত মনের তৈরী জিনিস। চটকদার মলাটওয়ালা অসার বিলিতী নভেল, সিনেমার ম্যাগাজিন ইত্যাদি। অন্যদিন এখানে বেছে বেছে দেখি, যদি ভালো কিছু পাওয়া যায়। আজ আর বাছবার মতো ধৈর্য ছিল না। মনের আকাশের চেহারা আজ ঘসা পয়সার মতো, নীলিমার সৌন্দর্য তো নেই-ই,

মেঘভরা বাদল দিনের রূপও নেই—নিতান্তই ঘসা-পয়সার মতো চেহারা।

সিনেমা দেখতে যাব? উট্রাম ঘাটে বেড়াতে যাব? কোথাও বসে খুব গরম চা খাব? লেকের দিকে যাব?—

ধর্মতলার গির্জার সামনে এক জায়গায় লোকের ভিড় জমেচে। একটা সাহেবী পোশাক-পরা লোক ফুটপাথে অজ্ঞান হয়ে শুয়ে আছে, ধড়টা ও মাথাটা পরস্পরের সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক কোণের সৃষ্টি করেচে যে, মনে হচ্চে লোকটা মারা গিয়েচে। ছুজন সার্জেণ্ট এলো। লোকে বললে, সামনের বাড়ির নিচের তলায় ওই বাথ-রুমের মধ্যে পড়েছিল এই অবস্থায়, বাড়ির দারোয়ান ধরাধরি ক'রে তার সংজ্ঞাহীন নিঃসাড় দেহটা একটা ট্যাক্সিতে তুলে নিয়ে কোথায় গেল।

লোকটার ওপর সহানুভূতি হ'ল আমার। সেই নির্বোধ বধূটার ওপর যা হয়নি, এ বেহুঁশ মাতালের ওপর তা হ'ল। বেচারা আনন্দের খোঁজে বেরিয়েছিল, পথও যা হয় একটা ধরেছিল, হয় তো ভুল পথ, হয় তো সত্যি পথ···আনন্দের সত্যতা তার মাপকাঠি—কে বলবে ওর কি অভিজ্ঞতা, কি তার মূল্য? ওই জানে। কিন্তু ও তো বেহুঁশ!

কার্জন-পার্কের সামনে এলুম। অনেকগুলো চাকর ও আয়া সাহেবদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বৃষ্টির ভয়ে গাড়ি-বারান্দার নিচে ফুটপাথের উপরে বসে আছে। বৃষ্টি একটু একটু বাড়চে, আমিও সেখানে দাঁড়ালুম। একটা ছোট্ট ছেলে, ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া সোনালী চুল, নীল চোখ, বছর দেড় কি ছুই বয়েস—সে তার চাকরের টুপিটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে টলতে টলতে উঠে অতি কষ্টে নাগাল পেয়ে চাকরের মাথায় টুপিটা পরিয়ে

দিচ্চে। আর যেমন পরানো যাচ্চে, অমনি হাত নেড়ে, ঘাড় দুলিয়ে দন্তহীন মুখে হেসে কুটি-কুটি হচ্চে। কিন্তু টুপিটা ভালো করে মাথায় বসাতে পারচে না, একটু পরেই গড়িয়ে পড়ে যাচ্চে, আবার খোকা অতি কষ্টে টুপিটা মাথায় তুলে দিচ্ছে··· আবার সেই হাসি, সেই হাত-পা নাড়া, সেই নাচ।···তাকে কেউ দেখচে না, কারুর দেখবার সে অপেক্ষাও রাখচে না, তার চাকর পার্শ্ববর্তিনী আয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপে এমন অন্যমনস্ক, খোকা কি করচে না করচে সেদিকে তার আদৌ খেয়াল নেই, নিকটের অন্য অন্য ছেলেমেয়েরাও নিতান্ত শিশু—ওই খোকাটি আপন মনে বার বার টুপি পরানো খেলা করচে।

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইলুম। নরম-নরম কচি হাত পায়ের সে কি ছন্দ, কি প্রকাশ—ভঙ্গির কি সজীবতা, কি অবোধ উল্লাস, কি অপূর্ব সৌন্দর্য!···খুশির আতিশয্যে খোকা আবার সামনে ঝুঁকে-ঝুঁকে পড়চে, একগাল হাসচে, ছোট ছোট মুঠি-বাঁধা হাত দু'টো একবার তুলচে, একবার নামাচ্চে···শিশুমনের আগ্রহভরা উল্লাসের সে কি বিচিত্র, কি সুস্পষ্ট, ভাষাহীন বার্তা!······

আমি আর চোখ ফেরাতে পারিনে। হঠাৎ অদৃষ্টপূর্ব, অপ্রত্যাশিত সৌন্দর্যের সামনে পড়ে গিয়েছি যেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম। হঠাৎ চাকরটার হুঁশ হ'ল—সে আয়ার সঙ্গে গল্প বন্ধ করে খোকার দিকে ফিরে টুপিটা তার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পাশে একটা পিরাম্বুলেটারের মধ্যে রেখে দিলে। খোকার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে টলতে টলতে পিরাম্বু-লেটারের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, কিন্তু বড্ড উঁচু—তার ছোট্ট হাত দুটি সেখানে পৌঁছয় না। সে একবার অসহায়ভাবে এদিক

ওদিক্ চাইলে, তারপর থপ্ করে বসে পড়ল। চাকরটা আয়ার সঙ্গে গল্পে মত্ত।

কার্জন-পার্কের বেঞ্চির ওপর গিয়ে বসলুম। সূর্য অস্ত যাচ্চে। গঙ্গার অপর পারে আকাশ রাঙা হয়ে এসেচে।

খোকার মনের সে অর্থহীন আনন্দ আমার মনে অলক্ষিতে কখন সংক্রামিত হয়েচে দেখলুম। খোলার ঘরের সেই মেয়েটিকে আর নির্বোধ মনে হ'ল না।

শেষ